বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে মুক্তিযুদ্ধ করেছি

স্মৃতিচারণা

বীর মুক্তিযোদ্ধা মিজানুর রহমান বাচ্চু

(যুদ্ধকালীন কমান্ডার, ৯ নং সেক্টর)
সিনিয়র সহ-সভাপতি, নারায়নগঞ্জ জেলা আওয়ামীলীগ
উপদেষ্টা
মুক্তিযোদ্ধার ইতিহাস সংরক্ষণ কমিটি বাংলাদেশ

সম্পাদক

মো. মাসুদুল করিম অরিয়ন

তাকিয়া মোহাম্মদ পাবলিকেশন্স

১১,১১/1 বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রকাশক : মো. আসাদুজ্জামান (মামুন)
বিএসএস (অর্থনীতি); এমএসএস (জাঃবিঃ)
☎ ০১৭১২৮৯৯৮৮৯, ০১৯১১০৩৩৩৩৬.

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০২১

গ্রন্থস্বত্ব : মুক্তিযোদ্ধার ইতিহাস সংরক্ষণ কমিটি বাংলাদেশ

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : মো. মাসুদুল করিম অরিয়ন
প্রচ্ছদ : তাসনিম বিনতে হানিফ
অলংকরণ : মোছা. হাবিবা মোবাশ্বেরা সাবাহ

মূল্য : ২০০ টাকা

ISBN : ৯৭৮-৯৮৪-৯১০৯৪-৭-১

উৎসর্গ

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে
যে ত্রিশ লক্ষ লোক শহীদ হয়েছেন এবং
যে দুই লক্ষ মা বোন ইজ্জত হারিয়েছেন তাদের প্রতি
আমার এই ক্ষুদ্র লেখাটি উৎসর্গ করলাম।

মুখবন্ধ

যে দেশে জুতা বিক্রি হয় এসি রুমে, আর বই বিক্রি হয় রাস্তার পাশে ফুটপাতে। সে দেশে দুর্নীতিবাজ থাকবে পাঁচতলায়, আর জ্ঞানীজন থাকবে গাছতলায় এটাই স্বাভাবিক।

সম্পাদকীয়

মুক্তিযুদ্ধ বাঙ্গালির হাজার বছরের কালজয়ী ও সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা। অসীম সাহসীকতা, বীরত্ব, আত্মত্যাগ আর অবর্ণনীয় দুঃখকষ্ট উৎরে যাওয়ার এক বড় ক্যানভাস। মুক্তিযুদ্ধের অনেক ইতিহাসই রচিত হয়েছে তবে এর সূর্যসৈনিক যারা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ডাকে সাড়া দিয়ে নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তাদের ইতিহাস সংরক্ষণ নেই। কিন্তু তারা বাঙ্গালি, জাতির বীর ও সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান। আর এই প্রত্যেক মুক্তিযোদ্ধারই আছে আলাদা আলাদা অসীম সাহসীকতা, বীরত্বগাঁথা দিনপঞ্জি ও আত্মত্যাগের ইতিহাস। কালের গহ্বরে অনেকেই আজ বিলীন হয়ে গেছেন, কিছু সংখ্যক এখনও বেঁচে আছেন, তাঁদের আমরা ক'জনইবা চিনি অথবা তাঁদের খোঁজ রাখতে পারি? এঁরাও একদিন আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়তে হলে সেই সব অকুতোভয় কালজয়ী বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বগাঁথা ইতিহাস সংরক্ষণ অত্যন্ত জরুরী এবং আগামী প্রজন্মের কাছে এই মুক্তিযোদ্ধাদের অসীম সাহসীকতা, বীরত্বগাঁথা আত্মত্যাগের ইতিহাস পৌঁছে দেয়া আমাদেরই দায়িত্ব ও কর্তব্য।

"মুক্তিযোদ্ধার ইতিহাস সংরক্ষণ কমিটি বাংলাদেশ" স্বউদ্যোগে মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যক্তিগত যুদ্ধের বীরত্বগাঁথা ইতিহাস সংরক্ষণ, প্রত্যক্ষদর্শীর যুদ্ধের বর্ণনা ও মুক্তিযোদ্ধাদের জীবনচিত্র বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার লক্ষ্যে ওয়েবসাইট www.mssangsad.com ও বই আকারে প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ৩,২৭০টিরও বেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে "মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধকরণ কর্মশালা" সহ বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসছে। ভুয়াদের যুদ্ধের কোন বীরত্বগাঁথা নেই, আর এরা দেশের শত্রু ও দেশের জনগণের সম্পদ বিনষ্টকারী।

পরিশেষে সরকার ও স্বাধীনতার স্বপক্ষের প্রত্যেক ব্যক্তিবর্গের কাছে সার্বিক সহযোগীতা কামনা করছি।

ধন্যবাদান্তে

মো. মাসুদুল করিম অরিয়ন

সভাপতি ও উদ্যোক্তা (মুক্তিযোদ্ধার ইতিহাস সংরক্ষণ কমিটি বাংলাদেশ)
মোবাইল: ০১৭১৫৪৪৮৪২৮
Facebook: মাসুদুল করিম অরিয়ন
Youtube: MISC BD

বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. মিজানুর রহমান বাচ্চু

যুদ্ধকালীন কমান্ডার ৯ নং সেক্টর

বর্তমান সিনিয়র সহ-সভাপতি নারায়নগঞ্জ জেলা আওয়ামীলীগ।

আমি ১৯৪৭ সালের ৩১শে মার্চ বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের মালদাহ জেলায় জন্মগ্রহণ করি। আমার পিতা আলহাজ মো. দরবার আলী ওখানকার সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন। আমার মাতা মরহুমা জোবেদা খাতুন। আমরা সাত ভাই, চার বোন। আমি আমার বাবা মায়ের ৬ষ্ঠ সন্তান। আমার বড় ভাই মৃত জনাব বজলুর রহমান বাংলাদেশ নৌপরিবহন সংস্থার সহকারী পরিচালক ছিলেন। আমার মেজ ভাই মো. হাবিবুর রহমান নারায়নগঞ্জ তোলারাম কলেজের বাণিজ্য বিভাগের অধ্যাপক ও দৈনিক ইত্তেফাকের ষ্টাফ রিপোর্টার এবং বাংলাদেশ ডেইলি অবজারভারের কমার্শিয়াল এডিটর ছিলেন। তিনি নারায়নগঞ্জ জেলা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি এবং নারায়নগঞ্জ তোলারাম কলেজের ছাত্রছাত্রী সংসদেরও সহ-সভাপতি ছিলেন। আমার ছোট ভাই মো. সাইদুর রহমান ভারতীয় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ২নং সেক্টরের একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। আর অন্য তিন ভাই সফিউল আজম দুলাল, ওয়াজেদ আলী বাবু এবং আবু আহসান সকলেই বিভিন্ন ব্যবসার সাথে জড়িত। আমার বড় বোন মরহুমা আম্বীয়া খাতুন চট্রগ্রাম সরকারি কলেজ থেকে স্নাতক পাশ এবং তার স্বামী মরহুম কাজী আব্দুর রশিদ চট্রগ্রাম সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। ওনাদের তিন মেয়েই চট্রগ্রাম সরকারি কলেজ ও ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপনা করছেন। আমার ২য় বোন মোছা. সুফিয়া খাতুন চট্রগ্রাম সরকারি কলেজ থেকে স্নাতক পাশ এবং তিনি ৭০ এর নির্বাচনে

ব্রাহ্মণবাড়িয়া ৪ আসন, কসবা নির্বাচনী এলাকার আওয়ামীলীগের দলীয় এমসিএ বীর মুক্তিযোদ্ধা সৈয়দ এ কে এম এমদাদুল বারীর স্ত্রী। তার প্রথম কন্যা বর্তমানে প্রবাসী কল্যান মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব সৈয়দা সাহানা বারী। আমার তৃতীয় বোন মোছা. খোদেজা বেগম, তিনি সাবেক শিল্প মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব বীর মুক্তিযোদ্ধা মরহুম শহিদুল ইসলামের স্ত্রী। আমার ছোট বোন মোছা. খোর্শেদা বেগম, তিনি পাকিস্তান ও বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের খেলোয়াড় মরহুম হাজী আবুল কাশেমের স্ত্রী।

আমার শৈশব, তরুন, যৌবন ও বর্তমান সময়টা কেটেছে আমার পৈত্রিক ভিটা নারায়নঞ্জের খানপুর ও আড়াইহাজারের জোকারদিয়া গ্রামে। আমি নারায়নগঞ্জ বার একাডেমী থেকে এসএসসি এবং নারায়নগঞ্জ তোলারাম কলেজ থেকে এইচএসসি ও স্নাতক পাশ করেছি।

এরপর জীবন জীবিকার তাগিদে বিভিন্ন চাকুরী ও ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত হই।

- প্রয়োজনের চেয়ে বেশি বিশ্বাস করলেই ঠকতে হয়।
- খারাপ তো নিমিষে হওয়া যায়, কিন্তু ভাল হতে সারা জীবন লেগে যায়।

সূচি

ক্রমিক নং	শিরোনাম	পৃষ্ঠা নম্বর
১.	মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ নাতি নাতনীদের নিয়ে	৯
২.	বাগুন্ডি ক্যাম্পে ১৫ বছর বয়সি মুক্তিযোদ্ধার হাতে হওয়া দুর্ঘটনার হৃদয় বিদারক ঘটনা	১২
৩.	যুদ্ধে যাত্রা	১৯
৪.	ভারতীয় নাগরিকদের আতিথেয়তা	২৩
৫.	স্মৃতির পাতার কিছু না বলা কথা "আজ বেলা শেষে কত স্মৃতি মনে পড়ে যায়"	২৮
৬.	দেশকে ভালোবেসে কতটুকু ত্যাগ করতে পারে দেশের সোনার সন্তানরা?	৩৩
৭.	ঠিক যেন বাংলাদেশ থেকে একটা নক্ষত্র খসে পড়ে গেল	৩৭
৮.	বহুত পার্থক্য রয়েছে সেকাল আর একালের রাজনীতিবিদদের মধ্যে	৪২
৯.	যাদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় বাগুন্ডি ক্যাম্প থেকে হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিয়েছিল	৪৮
১০.	এই চরিত্রের লোকগুলো হয়তো আগামী পাঁচ থেকে দশ বছর পর নাও বেঁচে থাকতে পারে	৫০
১১.	কী ঘটেছিল সেদিন? ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১	৫৫
১২.	আজও জানতে পারলাম না কেন সেই ১ মাস আমাদের কারাগারে বন্দি করে রেখেছিলো	৬০
১৩.	৪৬ বছর পর দেখা হল রণাঙ্গনের দুই মুক্তিযোদ্ধার সাথে	৬৭
১৪.	আজও মনে পড়ে আমার, তাদের কথা	৭১
১৫.	আমি মন থেকে দোয়া করি আল্লাহ যেন তার স্মরণশক্তি ফিরিয়ে দেন	৭৫
১৬.	বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কিছু না বলা কথা	৭৮
১৭.	গুরুদক্ষিণা	৮৩
১৮.	আমার সেই ফেলে আসা বাকুন্ডি ক্যাম্পে একদিন ফিরে যাওয়া	৮৫
১৯.	গল্প নয় সত্যি	৮৯

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণা নাতি নাতনীদের নিয়ে

আমি একাত্তরের রণাঙ্গনের বীর মুক্তিযোদ্ধা, আমার কাছে এখনকার স্কুল-কলেজের ছেলে-মেয়েরা প্রায়ই মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা শুনতে চায়। কিভাবে যুদ্ধ করলাম, কোথায় ট্রেনিং নিলাম, কিভাবে গেলাম, কি করলাম, কেমন ছিলাম ইত্যাদি ইত্যাদি। আমার নাতনীর নাম তাসনিম বিনতে হানিফ। সে খুবই জোরাজুরি করে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকথা শুনতে, সে একেবারে পাগল হয়ে থাকে যুদ্ধের ঘটনা শোনার জন্য। আমি তাকে বললাম, প্রতিদিন আমি তোমাকে যুদ্ধের বীরত্বগাঁথা শোনাই, তাই আজ তোমাকে এমন কিছু কথা শোনাবো তা হলো যাদের সাহায্য না পেলে শুধু আমি কেন, কোন মুক্তিযোদ্ধা এই মুক্তিযুদ্ধে জয়ী হতে পারতো না। সেই ঘটনাই এখন বলছি। আমি নারায়ণগঞ্জে থাকি, পাকবাহিনী ঢাকায় ক্র্যাক ডাউন করলো ২৫ শে মার্চ রাতে। সেদিন ছিল সম্ভবত বৃহস্পতিবার। ২৭ তারিখে তারা নারায়ণগঞ্জ অ্যাটাক (আক্রমণ) করল, আমরাও তাদের প্রতিরোধ করলাম। তবে তাদের এলএমজি, মেশিনগান এর সামনে আমরা দেশি বন্দুক ও রাইফেল নিয়ে খুব বেশিক্ষণ টিকতে পারলাম না। যাহোক, তারপর তারা নারায়ণঞ্জে ঢুকলো, নারায়ণগঞ্জ শহরের অর্ধেকের বেশি মানুষ নদী পার হয়ে ওপারে চলে গেল। এরপর ওরা নারায়ণগঞ্জ শহরের পুরো দখল নিয়ে নিল। এর আগে বঙ্গবন্ধু ২৬ মার্চ রাতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন এবং আমাদেরকে বলেছিলেন, আমরা যেন তাদেরকে মোকাবেলা করি। তারও আগে ৭ মার্চ ১৯৭১ এ বঙ্গবন্ধু ভাষণে বলেছিলেন "এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, তোমাদের যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে, আমি যদি নাও থাকি তবে তোমরা রাস্তা-ঘাট, কল-কারখানা সবকিছু বন্ধ করে দিবে।" আমরা উৎসাহিত হয়েছিলাম, সেদিন থেকে মানসিক ভাবে আমরা প্রস্তুত নিয়েছিলাম যুদ্ধের জন্য। এরপর মার্চ মাসের পাঁচ-ছয় দিন কাটালাম। শহরে ঢুকতে পারিনি, শহরের আশপাশ দিয়ে আমরা থাকতে লাগলাম। আমার বাড়ি নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার, আমি আমার এক ভাতিজাকে বললাম আমাকে যুদ্ধে যেতে হবে। সে বললো, আমিও যাবো, আমরা দুজনে মিলে রওয়ানা হলাম। মেঘনা পার হয়ে, বাঞ্ছারামপুর পার হয়ে সারাদিন হেঁটে দুলালপুর নামক বাজারে গিয়ে পৌঁছলাম। গিয়ে দেখি বাজারে একজন মানুষও নেই, কোন ঘর খোলা নেই, নিস্তব্ধ একটা

পরিবেশ। পেটে অনেক ক্ষুধা, আমরা কোথাও খাবার জন্য কিছু পেলাম না। আশেপাশে অনেক বাড়িতে গেলাম কিন্তু কোনো বাড়িতে লোকজন পেলাম না। এরপর গ্রামের শেষ প্রান্তে দেখলাম একটি বাড়ির মধ্যে টিম টিম করে একটা আলো জ্বলছে, কুপি বাতির আলো, আমরা আস্তে আস্তে ওখানে গেলাম দরজায় টোকা দিলাম। তখন ভেতর থেকে একজন বৃদ্ধা মহিলা বললেন, কে বাবা তোমরা? আমি বললাম, "মা একটু দরজা খোলেন।" উনি বললেন, "আচ্ছা বাবারা একটু অপেক্ষা করো।" এরপর তিনি দরজা খুলে বের হলেন। আমরা দেখলাম ষাটোর্ধ্ব এক মহিলা। বৃদ্ধা মহিলা বললেন, "ভিতরে আসো"। আমরা ভিতরে গেলাম, দেখলাম ভিতরে একটা চৌকি, তার ওপরে কাঁথা বিছানো, একটা মলিন বালিশ আছে তার উপরে, এখানেই তিনি থাকেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "বাবারা তোমরা কোথা থেকে এসেছো।" আমরা বললাম, নারায়ণগঞ্জ থেকে এসেছি। আবার উনি বললেন, কিছু খাওয়া-দাওয়া করেছো তোমরা? আমি বললাম, না কোথাও কিছু খাবার পেলাম না। বৃদ্ধা বললেন, বাবা তোমরা বড়লোক মানুষ কিছু যদি মনে না করো তাহলে আমার কাছে কিছু ভাত আছে, আমি তোমাদের কিছু ভাত দেই। এ কথা বলে উনি আমাদের ভাত দিলেন, সাথে আলু ভর্তা ও কাঁচামরিচ। তখন ওই ভাত আমরা খেলাম। আমার মনে হলো আমার জীবনে যত বড় বড় হোটেল ও বিভিন্ন স্থানে খেয়েছি কিন্তু এত তৃপ্তি কোথাও পাই নাই। আমি ও আমার ভাতিজা দুজনে খুব তৃপ্তি সহকারে ভাতগুলো খেলাম। খাবার পরে বৃদ্ধা মহিলা বললেন, "বাবারা আপনারা এখানে শুয়ে থাকেন।" তাই বলে চৌকির মধ্যে ব্যবস্থা করে দিলেন। আমরা সারাদিন হাঁটার ফলে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। আমরা শুয়ে পরলাম, উনি দরজা দিয়ে বাইরে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পর একটা আওয়াজ কানে আসলো। কি ব্যাপার! উনি কি করছেন? আমরা বাইরে গিয়ে দেখি, উনার বারান্দার মধ্যে একটা ছাগল বাধা, সেই ছাগলের পাশে মাদুর বিছিয়ে তিনি শুয়ে আছেন, মাথার তলে কাঁথা পেঁচিয়ে বালিশ বানিয়েছেন এবং মাথার কাছে মাটির একটা বাসনে মুড়ি নিয়ে সেই মুড়ি খাচ্ছেন। আমরা বৃদ্ধা মাকে বললাম মা আপনি এখানে আসেন, এখানে এসে ঘুমান। উনি বললেন, না বাবা তোমরা এসেছো, তোমরা দেশের জন্য আজকে ওপারে যাচ্ছো, আমি তোমাদের জন্য কিছুই করতে পারলাম না। তা বাবা আমার যতটুকু আছে তা দিয়ে তোমাদের সেবা করতে চেষ্টা করছি। তখন আমি আমার ভাতিজাকে বললাম, "দেখ আজকে যদি উনি আমাদের সাহায্য না করতেন তাহলে

আমরা রাতটা কোথায় থাকতাম, যতটুকু ভাত আমরা খেয়েছি তৃপ্তির সাথে খেয়েছি এই খাবারটা কোথায় পেতাম, সেই রাতে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম যদি মুক্তিযুদ্ধ থেকে কোনোদিন দেশে ফিরে আসি, তাহলে এই বৃদ্ধা মহিলার জন্য কিছু একটা করবো। যুদ্ধ শেষে এলাকায় ফিরে এলাম, তারপর নিজেকে দেশের কাজে নিয়োজিত করলাম এবং রাজনীতির মধ্যে এমনভাবে জড়িয়ে গেলাম ঐ বৃদ্ধার কথা আর কোনদিন মনে হয়নি। আজকে পঞ্চাশ বছর পরে এসে ওই ঘটনা মনে পড়ার পর নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছে এবং ভিতরে ভিতরে আমার মনে হয়েছে যে, আমি কত বড় পাপ করেছি ওই বৃদ্ধা মহিলার একটা খবর নিতে পারিনি, যা আমার নেয়া উচিত ছিল।

একবার মনে হয় ওখানে যাই, আবার মনে হয় আমিতো এখন ওই বাড়িটি খুঁজে পাবো না আর। যুদ্ধের সময় উনার বয়স ছিল ৬০ বছর, এখন ১১০ বছর হবে, হয়তো এতোদিন উনি আর বেঁচে নেই। তবে আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করি আল্লাহ যেন উনাকে বেহেশত নসিব করেন এবং আল্লাহর কাছে আমি ক্ষমা চাই। আল্লাহ যেন আমাকে ক্ষমা করেন কারণ, আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম তার খবর নিবো। কিন্তু তা আমি নিতে পারি নাই। আমি সকল নতুন প্রজন্মকে বলতে চাই, "শুধু আমি মুক্তিযোদ্ধা নই, যত মুক্তিযোদ্ধা ওপারে গিয়েছে এবং অস্ত্র নিয়ে দেশের ভিতরে প্রবেশ করেছে, তখন যদি বাংলার জনগণ তাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা না করতো তবে পাকবাহিনীর সাথে আমরা দুই থেকে তিন ঘন্টার বেশি টিকে থাকতে পারতাম না। বাংলার জনগণকে অনেক লাঞ্ছিত হতে হয়েছে পাক আর্মিদের হাতে মুক্তিযোদ্ধাদের না দেখিয়ে দেবার জন্য। তারা অনেকে গুলি খেয়ে মরেছে, অনেক কষ্ট করেছে, তাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে পাক আর্মিরা, তারপরও তারা মুক্তিযোদ্ধাদের খোঁজ পাক আর্মিদের দেয় নাই।

এই ছিল তখনকার পুরো বাংলাদেশের বাস্তব চিত্র। আজকে মুক্তিযোদ্ধা যাচাই বাছাই হচ্ছে। আমি মনে করি মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা না করে তৎকালীন রাজাকার, আলবদর, আলশামস কারা ছিল তাদের তালিকা করা উচিত এবং এই তালিকা বাদ দিয়ে যারা ছিলেন তাদের সবাইকে মুক্তিযুদ্ধের সৈনিক হিসেবে সম্মানিত করা উচিত।

বাগুন্ডি ক্যাম্পে ১৫ বছর বয়সি মুক্তিযোদ্ধার হাতে হওয়া দুর্ঘটনার হৃদয় বিদারক ঘটনা

আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা, এটিই আমার বড় পরিচয়। যুদ্ধের মাঠে আমি দীর্ঘ নয় মাস ছিলাম, নয় মাসে বহু ঘটনা ঘটেছে। এক একটা ঘটনা বলে যদি কিছুটা হলেও নতুন প্রজন্মকে উৎসাহিত করতে পারি। আজ যাদের বয়স পঞ্চাশ এর মধ্যে আছে, তারা মুক্তিযুদ্ধ দেখেনি তবে তারাও একটু অনুপ্রাণিত হবে। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি তাদের সম্মান বাড়বে। মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মান বাড়ানো, তাদের প্রতি যে একটা শ্রদ্ধা, এটা তাদের মনের মাঝে জাগাতে পেরেছি এবং চেষ্টা করছি, এতে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। আজ একটা নতুন কথা শোনাবো, আমাদের মুক্তিযুদ্ধটা হয়েছে ১১টা সেক্টরে। নয় নম্বর সেক্টর পর্যন্ত সেক্টরগুলি দৃশ্যমান ছিল, আর দুটি সেক্টর একটি নৌবাহিনী আর অন্যটি বিমানবাহিনী এই দুটি সেক্টর দৃশ্যমান ছিলো না। আমরা যারা মুক্তিযোদ্ধা ছিলাম, আমরা স্থলবাহিনীর সাথে যুদ্ধটা করেছি। আমার বাড়ি নারায়ণগঞ্জ। কিন্তু আমি যুদ্ধ করেছি ৯ নম্বর সেক্টরে। দুই নম্বর থেকে আমি ৯ নম্বরে কেনো গেলাম সেটা আর একদিন ব্যাখ্যা করবো। আজ যে ঘটনাটি বলবো সেটা যিনি ঘটিয়েছেন তিনি আজও জীবিত আছেন। যদি আপনাদের কারো ইচ্ছে জাগে উনি এখন কেমন আছেন, কিভাবে আছেন, তার অনুভূতি কি, তার কাছে জেনে নিতে পারেন। আমি ৯ নম্বর সেক্টরে একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলাম, একজন প্রশিক্ষক ছিলাম। আমাকে এক্সপ্লোসিভের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। আমার ডিউটি ছিল যারা নেভাল ট্রেনিং করে মুর্শিদাবাদ থেকে বাংলাদেশে যেতো, যাওয়ার সময় আমাদের কাছ থেকে তারা সরঞ্জাম নিয়ে যেতো। তাদের সরঞ্জাম ছিল "লিমপেট মাইন"। আমরা তাদের কিছু দিয়ে দিতাম আর বাকিগুলো যাতে তারা দেশের মধ্যে তৈরি করতে পারে, সে প্রশিক্ষণটা দেওয়া এবং এদেরকে সকালে পিটি করানোর দায়িত্বও ছিল আমার উপর। এটা সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝির দিকে হবে। আমি তাদের পিটি করাচ্ছি হঠাৎ একটা গুলির আওয়াজ হলো ক্যাম্পের মধ্যে। গুলির আওয়াজ শোনার পর আমার কান খাড়া হয়ে গেলো, ব্যাপারটা কি? ক্যাম্পের মধ্য থেকে গুলির আওয়াজ কেনো আসবে? আমরা যে প্রশিক্ষণ ক্যাম্প করেছি এটিতে অনেকগুলো ধাপ, সাত আটশত মুক্তিযোদ্ধা সব

সময় এখানে থাকে। এরা বিভিন্ন স্থান থেকে ট্রেনিং নিয়ে এসে আমাদের কাছে থেকে এ্যামুনেশন নেয়। আর্মস এ্যামিউনেশন নিয়ে বাংলাদেশের ভিতরে আমরা তাদের যাওয়ার ব্যাবস্থা করি। যারা নেভাল বেইজ আছে আর যারা সুইসাইড স্কোয়াড আছে, তাদেরকে মাইন বানানোর প্রশিক্ষণ এখানে দেই। গুলির আওয়াজ শুনে স্তব্ধ হয়ে গেলাম। ঘটনাটা কি? তাড়াতাড়ি দেখি একটা টেন্টের ভেতর থেকে কান্নার আওয়াজ আসছে। দৌড়ে গেলাম, গিয়ে দেখি চাকুলিয়া থেকে মুক্তিযোদ্ধারা যারা আসে ট্রেনিং নিয়ে, তাদের মাঝ থেকেই একটা দল করে দেই। এরা রাতের বেলা পাহারা দিবে পুরো ক্যাম্পটা। সেই পাহারাদারদের মধ্যে একটা দল সকাল ছয়টা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ডিউটি করে। এর মধ্যে একবার তাদের রাত দুইটার সময় দল বদল হয়। একদল গিয়ে আরেক দল আসে। সকাল বেলা যাদের ডিউটি দেওয়া শেষ হয়েছে, তারা ক্যাম্পে এসে আর্মস গুলি ফ্রেশ ওয়েলিং করে, তারা অফিসে বুঝিয়ে দেয়। তাদের ভিতরে অস্ত্র পরিষ্কার করছিল একটা ছেলে। সে রাইফেল নিয়ে ডিউটি করতো। তার রাইফেলের চেম্বারের মধ্যে যে গুলি রয়েছিলো, সেটা তার খেয়াল ছিল না। সব ঠিক আছে কিনা সেটা দেখার জন্য ট্রিগারে টিপ দিয়েছে, তখন একটি গুলি বেরিয়ে তার সাথে যে মুক্তিযোদ্ধা ছিল, তার ডান পাশের কানের গোড়া থেকে ঢুকে বাম কানের পাশ দিয়ে বের হয়ে গেছে। ছেলেটা ঐখানেই সাথে সাথে মারা গেছে। এটা নিয়ে তার সহযোগীরা যারা ছিল, তারা কান্নাকাটি করছে এবং যে তাকে মারছে সে কর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পাশে বসে আছে, দুচোখ দিয়ে অঝোর ধারায় তার পানি পড়ছে। আমরা সবাই ছুটে গেলাম। আমাদের ক্যাম্প কমান্ডার ছিলো ক্যাপ্টেন সুলতান উদ্দিন সাহেব, তিনিও আসলেন। উনি হেটকোয়ার্টারে ওয়ারলেস করলেন। আধা ঘণ্টার মধ্যে সেক্টর কমান্ডার মেজর জলিল সাহেব আসলেন। এসে সব কিছু দেখলেন। একজনকে ডেকে সব বয়ান লেখালেন। তারপর যে ছেলেটা মেরেছে, তাকে লকাপের মধ্যে বন্দী করে রাখলেন। ছেলেটা তখন কাঁদছিলো, একটা বাচ্চা ছেলে। একজন মারা গেলে তাকে তো আমরা ফেরাতে পারবোনা, যে বেঁচে আছে তার কথা চিন্তা করে আমি খুব মর্মাহত হয়েছি, তার কান্না দেখে। ঘটনাটা সাতটা সাড়ে সাতটা হবে, তাকে দশটায় খাবার দিলো। ১২টার সময় আমার খুব কৌতূহল হলো, দেখবো ছেলেটা কি করে। গিয়ে দেখি ছেলেটা কান্না করছে। তাকে যে নাস্তা দেয়া হয়েছে ঐ নাস্তায় সে হাতও দেয়নি। খাবারগুলো সামনে রয়ে গেছে, সে খায়নি। আমি কিছু

বললাম না, দেখলাম চলে আসলাম। লকাপের দায়িত্বে ছিল এয়ারফোর্সের একজনের উপর। উনি আর্মসেরও দায়িত্বে ছিলেন, নাম লুৎফর রহমান। আল্লাহ জানে, উনি বেঁচে আছেন কিনা। আমি তাকে বললাম, লুৎফর ভাই দেখেন ছেলেটাকে একটু খাওয়ানোর চেষ্টা করেন। রাতে খবর পেলাম, ছেলেটা কিছুই খায়নি। রাতটা কেটে গেলো, পরের দিন সকালে আমি গিয়ে তার সাথে বসলাম। সে লকাপের ভিতরে আর আমি বাহিরে, আমি তাকে অনেক কথা জিজ্ঞেস করলাম। আমার কোনো কথার উত্তর সে দেয় না, শুধু ফ্যালফ্যাল করে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে আর চোখ দিয়ে শুধু পানি পড়ে। আমি বললাম যে, "দেখো কালকে কিছু খাওনি, রাতেও কিছু খাওনি, তুমি তো বাঁচবে না।" সে কেঁদে বললো যে, "স্যার আমি বাঁচতে চাইনা। আমার হাতে যে মারা গেছে সে আমার প্রিয় বন্ধু। আমরা একসাথে দেশে থেকে এসেছি, তার সাথে লঞ্চঘাটে আমার দেখা, তারপর এক সাথে বর্ডার পার হয়েছি, চাকুলিয়াতে এক সাথে ট্রেনিং নিয়েছি।" আমি তাকে বললাম, "আমি তোমার সব কথা শুনবো, তুমি আমাকে বলো, তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পারো, আমি চেষ্টা করে দেখি তোমার জন্য কি করতে পারি"। সেদিন আর তাকে কিছু বললাম না। তারপরের দিন এসে বললাম, তোমার নাম কি? কি করো? সে বললো দশম শ্রেণিতে উঠেছিলাম। তুমি যে যুদ্ধে এসেছো, তোমার আব্বা আম্মা জানে? সে বলে না স্যার জানে না। বলোনি কেনো? না স্যার বললে তো আমাকে আসতে দিতো না, এজন্য বলিনি। তোমার বাড়ি কোথায়? বললো আমার বাড়ি বরিশালের মুলাদি থানায়, যে ছেলেটি মারা গেছে সে কোন এলাকার তুমি জানো? বললো উজিরপুর থানায়। তার সাথে কথা বলতে বলতে আমার মায়া জমে গেলো। ১৫/১৬ বছর বয়স হবে ছেলেটির, এই অল্প বয়সে সে একটি বিপদে পড়লো। আমি যেখানে থাকি, প্রত্যেকে তাবু টানিয়ে তাবুর ভিতরে থাকে। ক্যাম্পের ইনচার্জ ক্যাম্প কমান্ডার ক্যাপ্টেন সুলতান উদ্দিন আর আমি এক তাবুতেই থাকি। আমি তাকে সুলতান ভাই বলে ডাকি, উনি আগরতলার মামলার আসামি ছিলেন। ১৯৬৯-এর গণআন্দোলনের সময় ওনার সাথে আমার পরিচয় হয়। ২/৩ দিন পর এক রাতে আমি জিজ্ঞেস করলাম সুলতান ভাই, এই ছেলেটিকে কি করা হবে? উনি বললেন, দেখো আমাদের কিছু করার নাই, ওর হাতে একজন মারা গিয়েছে, এখন ইচ্ছে করে মেরেছে না এক্সিডেন্টে মারা গিয়েছে এটা আল্লাহ জানে। তবে আমরা একে ভারতীয় সেনাবাহিনীর হাতে তুলে দিব। আমি বললাম ভারতীয় সেনাবাহিনী

নিয়ে কি করবে? সে বলল, তারা নিয়ে যা করার করবে। যারা বিপক্ষের শক্তির সাথে জড়িত, যারা আমাদের উপর আক্রমণ করতে পারে (সৈনিক, রাজাকার) আমরা তাদেরকে ভারতীয় সৈনিকের হাতে তুলে দেই। আমি ঐ রাতে আর কিছু বললাম না। পরের দিন আমি আবার ওনাকে বললাম, সুলতান ভাই, ছেলেটির জন্য আমার মায়া লাগে, কি করা যায় বলুন তো দেখি। সে বলে এ ব্যাপারে চিন্তা করো না, যা হবার হতে দাও। কিন্তু চিন্তা তো আমায় ছাড়ে না, এই রকম একটা ছেলে, বাংলা মায়ের সন্তান। আমি ১০০ ভাগ নিশ্চিত এটা একটা এক্সিডেন্ট। রাতে আমার ঘুম আসছে না, ১০টার সময় শুয়েছি, সাড়ে বারোটা বা ১টা বাজে, সুলতান ভাই আমাকে বলে, বাচ্চু তুমি কি ঘুমিয়েছো, আমি বললাম না। সে বললো কি ব্যাপার এখনও ঘুমাওনি, আমি উঠে বসলাম। বসার পরে বললাম, সুলতান ভাই আপনাকে একটা কথা বলবো, উনি বললেন বলো, আমি বললাম, ছেলেটাকে বাঁচাতে হবে। কি করে বাঁচানো যায় বলেন তো দেখি। আমি এই দুইদিন যাবত দেখছি, তুমি ঐ ছেলেটিকে নিয়ে চিন্তা করছো। আজকে ট্রেনিং দেওয়ার সময় খুব একটা মনোযোগ দেখিনি। তুমি যে এক্সপ্লোসিভ ট্রেনিং দিতে, তার সময় কমিয়ে দিয়েছো, আমার কাছে রিপোর্ট আছে। তুমি ঐ ছেলেটির সাথেই সময় কাটাও। আমি বললাম, হ্যাঁ সত্যি, কেন জানি মনে হয় ও আমার ছোটো ভাই, ও আমার শরীরের একটা অংশ। ভাই, যে কোনো কিছুর বিনিময়ে হোক আপনি একটু সাহায্য করেন। ওকে আমি বাঁচাতে চাই। পরে উনি বললেন, এটার ডিসিশন হবে রবিবার দিন। অফিস আদালত বন্ধ, রবিবার দিন মিটিং বসবে, তুমিও ওখানে থেকো। রবিবার মিটিংয়ে বসলাম, সবার কথা শুনলাম। কিন্তু বেশির ভাগ মতামত আসলো, "এই দায়িত্ব আমাদের নেয়া ঠিক হবে না"। বিচার যা করবে ভারতীয় সরকার করবে। তখন সুলতান ভাই মেজরকে বললেন, স্যার আমার একটা কথা, এরা তো অনেক দিন ধরে এখানে আছে, আমরাও হিসেব করে দেখেছি এটা পুরোপুরি একটা এক্সিডেন্ট। স্যার কিছু একটা করা যায়না? স্যার আপনিই পারেন কিছু একটা করতে, উনি বললেন, উর্ধ্বতন মহলের সাথে আলাপ করে দেখি। উর্ধ্বতন মহল, প্রধানমন্ত্রী তাজ উদ্দিন সাহেব এবং আমাদের সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ওসমানি সাহেব ওনাদের সাথে আলাপ করে বলবেন। মেজর জলিল সাহেব খুব চাপা স্বভাবের লোক ছিলেন। ৫/৭ দিন পরে উনি এসে সুলতান ভাইকে ডাক দিলেন। উনারা এক জায়গায় বসলেন। কি কথাবার্তা হয়েছে আমি জানিনা। কিন্তু অনুমান করতে পারি,

এরপর আমাকে ডাকলেন। ডেকে মেজর সাহেব বললেন, "তুমি নাকি এই ছেলেটাকে ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে খুব ইন্টারেস্টেড?" আমি চুপ করে থাকলাম, ক্যাপ্টেন সাহেব বললেন, 'খুলে বলো সব'। আমি তখন বললাম, স্যার। উনি বললেন, কেন? তোমার বাড়ি নারায়ণগঞ্জ তার বাড়ি বরিশাল। তার জন্য যদি মায়া থাকে আমার থাকবে, আমি বরিশালের ছেলে। আমার বাড়ি উজিরপুর তার বাড়ি মুলাদি। আমি বললাম, স্যার সে বাঙ্গালি, সে যুদ্ধ করে পাক বাহিনীর সাথে প্রাণ দিতে এসেছে। স্যার তার একটা এক্সিডেন্ট হয়েছে। উনি বললো বুঝতে পারছি। তুমি একটা কাজ করো, ওকে যদি তুমি নিতে চাও তাহলে, তোমার কাস্টডিতে রাখতে হবে। বললাম স্যার আমি রাজি। তবে একটা শর্ত, যতদিন তুমি ক্যাম্পে আছো, তুমি বাংলাদেশে না যাচ্ছো ততদিনে সে লকার থেকে বেরোতে পারবে না। আমি রাজি হলাম। সেপ্টেম্বর মাস গেল, অক্টোবরের মাঝামাঝি আমার যাওয়ার সময় হলো। আমাদের সবার জন্য আর্মস দেওয়া হলো। আমার সাথে ছিলো ৯০ জন সেনাবাহিনী, বিডিআর, পুলিশ ও আনসারের লোক। আমার সাথে বাকি ৪০ জন ছিলো, মুক্তিযোদ্ধা, ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক, জনতা। ১৩২ জনের দল নিয়ে, আমি ঢুকলাম সাথে ঐ ছেলেটাকে নিয়ে এসে আমি সুন্দরবনে ক্যাম্প করলাম। সুন্দরবন ক্যাম্পের পর মোংলা পোর্টের সাথে বাজুয়া বাজারে আমার মেইন ক্যাম্পটা করলাম। তখন আমার সাথেই তাকে রাখি। মোংলাতে বাজুয়া বাজারে আসার পরে আমি তার হাতে অস্ত্র দিলাম। কারণ, নিরস্ত্র অবস্থায় তাঁকে দুইটা তিনটা ফাইটে নিয়ে গিয়েছি। কিন্তু আজ পর্যন্ত এমন কিছু পাইনি যে, সে এখানে কারো বিরোধিতা করতে এসেছে, এর পরে যতগুলি অপারেশনে আমি গিয়েছি সে একদম আমার পাশ পাশে ছিল। যেন শত্রুর কোন গুলি আসলে আমার আগে সে বুক পেতে নেবে এভাবে সে আমার পাশে পাশে থাকতো। তারপর আমরা মোংলা পোর্ট এলাকা মুক্ত করলাম। চালনা পোর্ট মুক্ত করলাম, এরপর আমরা অভিযান শুরু করলাম খুলনার দিকে। পুরো বাংলাদেশে পাক আর্মিরা স্যারেন্ডার করেছে ১৬ তারিখে, কিন্তু খুলনাতে ওরা অস্ত্র স্যারেন্ডার করে নাই, সবুর খানের যে বাহিনীটা ছিল তারা ১৭ তারিখ পযর্ন্ত খুলনা শহরটাকে ধরে রেখেছিল। ১৮ তারিখ সকালে আমরা খুলনায় ঢুকেছি। ডিসেম্বর মাস যায়, জানুয়ারী মাসে যখন আমি ঢাকায় চলে আসি, এই ছেলেটাকে আমি সাথে নিয়ে আসি, আমার চিন্তা হলো এবং ক্যাপ্টেন সাহেবও আমাকে বলেছিল আপাতত তুমি তাকে বরিশাল পাঠিও না। তুমি তোমার

সাথে রাখো, তুমি ওকে নারায়নগঞ্জ নিয়ে যাও, দেশের অবস্থা বুঝে তারপর তুমি ওকে বরিশালে পাঠাবে। আমি তাকে ঢাকাতে সাথে করে নিয়ে আসলাম। ঢাকায় আসার পর সে আমাকে বললো আমাকে ছেড়ে দেন, আমার বাড়ির জন্য মনটা ভালো লাগছে না। আমার বাড়ি পর্যন্ত স্যার আমি সেফলি যেতে পারবো। আমি অনেক চিন্তা ভাবনা করে তার হাতে ২০০ টাকা দিয়ে তাকে সদরঘাট পযর্ন্ত পৌঁছে দিলাম। তারপর আমি বাড়িতে আসলাম। আসার পর দিন যায়, মাস যায়, বছর যায় এভাবে বহুদিন চলে গেল। ও আমার সাথে আর কোন যোগাযোগ করলো না। আমিও ব্যস্ততার মাঝে খুব একটা খবর রাখতে পারি নাই। যখন বিএনপি ২০০১ সালে ক্ষমতায় আসলো, এর আগে মুক্তিযোদ্ধা যাচাই বাছাই হয়, লাল মুক্তি বার্তায় নাম ওঠে, আমরা মুক্তিযোদ্ধারা ভাতা পাচ্ছি, এরপর আবার ২০05 সালে যাচাই বাছাই হলো তখন বিএনপি পুরো দেশব্যাপী যে অত্যাচার চালালো, তাতে আমরা এলাকা ছাড়া হয়ে ছিলাম, তখন আমি এই ছেলেটার খোঁজ করতে লাগলাম। কি ভাবে পাই? আমাকে খুলনার এক মুক্তিযোদ্ধা বললো, বরিশালের লাল মুক্তি বার্তা লিস্ট আমার কাছে আছে, আমি আপনাকে দিতে পারি। লাল তালিকা আমাকে দিলো, পুরো বরিশালের মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে একটা ইউসুফ পেলাম, ইউসুফ হাওলাদার। মুলাদি থানা, ফোন নম্বরটা দরকার। এবার বরিশালের জেলা কমান্ডারকে ফোন করলাম, তাকে বললাম আমি একজন মুক্তিযোদ্ধার সাথে যোগাযোগ করতে চাই তার বাড়ি মুলাদি থানায়, তিনি বললেন দেখুন মুলাদি সম্পর্কে আমার তেমন জানা নেই। আপনি গৌরনদী থানার যে কমান্ডার আছে তার নম্বরটা আমি দিচ্ছি, আপনি তার সাথে যোগাযোগ করেন। আমি গৌরনদী থানার কমান্ডারের সাথে যোগাযোগ করলাম। তিনি বললেন মুলাদি সম্পর্কে ভালো বলতে পারবেন উজিরপুরের কমান্ডার, উজিরপুরের কমান্ডারের নম্বর আমাকে দিল। আমি তার সাথে যোগাযোগ করলাম, তিনি বললেন, হ্যাঁ মুলাদিতে একজন ইউসুফ হাওলাদার আছেন তাকে তো ইউসুফ বললে চিনবে না। বলবেন ইঞ্জিনিয়র ইউসুফ। আমি বললাম, ভাই আপনি তার ফোন নম্বরটা আমাকে দিতে পারেন। তিনি বললেন পাঠাচ্ছি আপনাকে একটু পরে। ১০/১৫ মিনিট পরে উনি আমাকে ফোন করে নাম্বার দিলেন। আমি ফোন দিলাম একজন ধরলো, সালাম দিয়ে বললাম আপনি কি ইউসুফ সাহেব? বললো হ্যাঁ, আপনি কি মুক্তিযোদ্ধা? হ্যা, চাকুলিয়াতে ট্রেনিং নিয়েছেন? হ্যাঁ, বাকুন্ডি ক্যাম্পে ছিলেন? জ্বী, আচ্ছা ইউসুফ

সাহেব বাকুন্ডিতে কি আপনার কোন দূর্ঘটনা ঘটেছিল? জ্বী ঘটেছিল, সে বললো আপনি কে বলুন তো? আমি বললাম এতোদিন যখন আমার কথা মনে করেননি তখন আমার পরিচয় না-ই শুনলেন, আপনি এখন কি করেন? বললো যুদ্ধ থেকে আমি ফিরে আসার পরে বি.এম. কলেজ থেকে আইএসসি পাশ করার পরে ঢাকা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হয়ে বুয়েট থেকে আমি ইঞ্জিনিয়ার হয়েছি, রিটায়ার করে আমি এখন ব্যবসা করছি। আমি জিজ্ঞেস করলাম আপনি আছেন কোথায়? সে বললো, আমি আছি যাত্রাবাড়িতে। আমি বললাম ইউসুফ সাহেব আপনি কি আমাকে একটু সময় দিবেন? সে বললো, ভাই আমি তো আপনার পরিচয়টা জানলাম না। তখন আমি বললাম, "বাকুন্ডি ক্যাম্পে কে আপনাকে বাঁচিয়ে ছিল, কে আপনাকে সাথে করে নিয়ে এসেছিল? বললো আমাদের এক স্যার ছিল বাচ্চু স্যার উনি আমাকে বাঁচিয়েছিলেন, আমি বললাম আমি সেই বাচ্চু বলছি। একেবারে কান্নাকাটি শুরু করে দিলো, আমি বললাম এভাবে এভাবে আসেন, ঠিক ২ ঘন্টার মধ্যে আমার বাসায় এসে হাজির। এটা আমার জীবনের অত্যন্ত আনন্দময় একটা মুহূর্ত ছিল। ৪৭ বছর পরে ছেলেটার (ইউসুফ সাহেব) সাথে আমার দেখা হলো।

- টাকা থাকলে সবাই তোমাকে দাম দেবে, না থাকলে আপন জনেরাও তোমাকে চিনবে না।
- সুখি হওয়া মানে প্রাচুর্য নয় বরং যা আছে তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা।

যুদ্ধে যাত্রা

নতুন প্রজন্মের তোমরা যারা আছো তাদের জন্য আজ যে ঘটনা বলবো তা হলো আমার বাড়ি নারায়ণগঞ্জ ২ নং সেক্টরে, কিন্তু আমি কেন ৯ নং সেক্টরে যুদ্ধ করলাম। আমার মনে একটা ইচ্ছা আছে আমার লেখা যারা পড়ো আমার সন্তান বা নাতি-নাতনি সমতুল্য তারা সবাই, যারা বিশেষ করে নারায়ণগঞ্জের আছো আমি তোমাদেরকে আমার বক্তব্যের মাধ্যমে নিয়ে যাব ২ নম্বর সেক্টর থেকে ৯ নম্বর সেক্টরের যুদ্ধক্ষেত্রে।

রাতটা সেই বৃদ্ধা মায়ের ঘরের মধ্যে খুব আরামে ঘুমিয়েছি। ফজরের আজানের পর আবার উনার দরজা খোলার আওয়াজ শুনে ঘুম ভেঙে গেল। আমি চোখ খুলে দেখলাম উনি ওনার জায়নামাজ (খুব পুরনো একটা মাদুর) নিয়ে গেল, কতক্ষণ পরে আমি বেরিয়ে দেখি উনি নামাজ পড়ছেন। আমি হাত মুখ ধুয়ে আমার ভাতিজাকে ঘুম থেকে উঠালাম। সূর্য ওঠার আগেই আমরা সেখান থেকে রওয়ানা দিলাম। আমরা হাঁটতে হাঁটতে নবীনগরের শেষ প্রান্তে একটা হাইস্কুলে এসে পৌঁছলাম। তখন নয়টা কি সাড়ে নয়টা বাজে, সেখান থেকে তিতাস নদীর একটা শাখা ছিল সেটা পার হয়ে আমরা কসবা থানায় ঢুকলাম, গ্রামটার নাম ডাবিরঘর। ডাবিরঘর নদীর পাশে একটা বাজার আছে, বাজারের একটা দোকান থেকে আমরা নাস্তা করলাম। তারপর আমরা রওয়ানা দিলাম বর্ডারে যাওয়ার উদ্দেশ্যে। আমরা তো রাস্তা ঘাট চিনিনা, তাই রাস্তার মধ্যে যাদের সাথে দেখা হয় তাদেরকে বলি আমরা সীমান্ত পার হয়ে আগরতলা যাব, কোন রাস্তা দিয়ে আমরা যেতে পারি? তাদের কথা অনুযায়ী যেতে-যেতে বিকালের দিকে গিয়ে পৌছলাম তিতাস নদীর আর একটা শাখা উজানিষা এর পাড়ে। সেটা পেরিয়ে আমরা চারগাছ বাজার গিয়ে পৌছালাম। সেখানে গিয়ে আমরা জিজ্ঞেস করলাম, আমরা কিভাবে যেতে পারবো? তারা বললো, এখান থেকে আপনারা একা যেতে পারবেন না, তবে রাত দশটার দিকে শরণার্থীদের যাবার জন্য একটা নৌকা যাবে আপনারা সেই নৌকায় করে যেতে পারেন। কে নিয়ে যাবে তার দেখাও পেলাম, কয়েকজন ভলেন্টিয়ার ওখানে আছে, তাদের সাথে আলাপ করে জানতে পারলাম নৌকায় করে শরণার্থী ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত ২০ কিলোমিটার হবে, এই পথের ভাড়া মাথাপিছু ৩০ টাকা করে দিতে হয়। আমি ৩০ টাকা দিলাম, রাত্র দশটার আগেই যথারীতি নৌকায় উঠে

বসলাম। সব মিলিয়ে আমাদের নৌকাতে ৬০ জনের মতো লোক হবে, বেশিরভাগই হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক। আমরা যুবকদের মধ্যে ছিলাম পনেরো ষোলজন, বাকিরা সবাই হিন্দু সম্প্রদায়ের তারা তাদের পরিবার নিয়ে যাচ্ছিল শরণার্থী ক্যাম্পে। আমার ভাতিজা পেটের অসুখে আক্রান্ত হলো তাই সে আর আমার সাথে যেতে পারল না। আমি একাই রওয়ানা হলাম। আমার হাতে একটা ব্যাগ তাতে ছিল আমার লুঙ্গি, গামছা ও জামা। চারগাছ বাজার ছেড়ে নৌকা করে আধাঘন্টা এসেছি, এরপর নৌকাটি মাটির রাস্তার পাশে রাখল, আমি মাঝিকে জিজ্ঞেস করলাম, কি ব্যাপার এখানে? মাঝি বলল চুপ করে বসে থেকে দেখুন। আমি দেখলাম, একজন লোক আসলো, সে এসে দাঁড়াতেই মানুষ গোনা শুরু করলো, মাঝি আমাদেরকে বলল দশটা করে টাকা দেন, তখন সবার কাছ থেকে দশটা করে টাকা তুলে প্রায় ৬০০ টাকার মত হবে তা ওই লোকটার হাতে দিলো, যে লোকটা এসেছিল তার ঘাড়ে একটা রাইফেল ছিল, সে লুঙ্গি, জামা পড়া এবং কোমরে গামছা বাঁধা। আমি মাঝিকে জিজ্ঞাসা করলাম, এরা কারা? মাঝি বললো, এরা রাজাকার, সামনে সিএন্ডবি এর যে রাস্তা সেখানে একটা ব্রিজ আছে, সেই বড় ব্রীজটা যে জায়গায়, তার নাম তিল্লাকপীর, ব্রীজের নিচ দিয়ে যেতে হলে তাদেরকে টাকা দিতে হবে। কেননা ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে কুমিল্লা পর্যন্ত এই রাস্তাই একমাত্র গাড়ি চলাচলের রাস্তা এবং এখান দিয়ে আর্মিরা যাওয়া আসা করে। আর্মিদের কাছ থেকে শরণার্থীদের বাঁচাবার জন্যই রাজাকারদের এই ব্যবস্থা। স্থানীয় লোকজনের মধ্য থেকে এরা রাজাকারে নাম লিখিয়েছে, এভাবে তারা স্থানীয় লোকদের ও শরণার্থীদেরকে আর্মিদের হাত থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করছে। তারপর ওই লোক আমাদের বলে দিয়ে গেল যতক্ষণ পর্যন্ত নৌকা ব্রীজ পার না হয় এবং পরবর্তী গ্রামের কাছে না যায় ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ কথা বলবেন না এবং বিড়ি সিগারেট খাওয়ার জন্য দিয়াশলাই জ্বালাবেন না। আমরা চুপ করে বসে আল্লাহকে স্মরণ করতে লাগলাম এবং ব্রীজের নিচ দিয়ে নদী পার হলাম, নদীর ওপারে যাওয়ার পরে হঠাৎ নৌকার মাঝি বললেন, কেউ কোনো দিয়াশলাই জ্বালাবেন না চুপ করে বসুন আর্মি চলে এসেছে। আমরা দেখলাম সব অন্ধকার, আর্মি কোথায়? অনেক দূরে উজানিষার যে ব্রীজ আছে তার উপর দিয়ে জীপের আলো দেখা গেল। পরপর দশ-বারোটা গাড়ি। মাঝিরা পাঁচজন মিলে প্রাণপনে নৌকা চালিয়ে যাচ্ছে যত তাড়াতাড়ি গ্রামের আড়ালে পৌঁছা যায়। গ্রামের প্রায় কাছাকাছি পৌঁছালে এমন

সময় জীপগুলি সব এসে আমরা যে ব্রিজের নিচ দিয়ে এসেছি তার ওপর থামল। থেমে তারা হেডলাইট গুলো আমাদের দিকে ফেরালো এবং নৌকাটা হয়তো তাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। তারা ফায়ার ওপেন করলো। বৃষ্টির মতো নৌকার দিকে গুলি আসা শুরু হলো, আমরা দেখলাম গুলিগুলো পানির মধ্যে পড়ছে। মাঝিরা প্রাণপণে নৌকা বেয়ে নৌকাটা গ্রামের এক প্রান্তে ভিড়িয়ে দিল এবং বললো আপনারা নেমে গিয়ে যে যেখানে পারেন গ্রামের ভিতর লুকিয়ে পড়েন। আমরা নৌকা থেকে ঠেলাঠেলি করে নামতে গিয়ে নৌকাটা ডুবে গেল। তার কিছুক্ষণ পর গোলাগুলির শব্দ বন্ধ হয়ে গেল এবং আর্মিরা চলে গেল। আমরা নৌকাটা উঠিয়ে পানি সেচে আবার রওয়ানা হলাম। প্রায় দুই থেকে আড়াই ঘন্টা চলার পরে সালদা নদীর পাড়ে একটা স্টেশন আছে, সেখানে একটা রেলওয়ে ব্রীজ আছে, ব্রীজের তল দিয়ে গিয়ে একটা গ্রামে নৌকা ভিড়লো । মাঝিরা বললো, আপনারা এসে পড়েছেন, সবাই নামেন। আমরা সবাই নামলাম, কেউই আমরা কোন রাস্তাঘাট চিনিনা, কিন্তু যারা এখানে শরণার্থী হয়ে এসেছে তাদের মধ্যে কয়েকজনের আত্মীয়-স্বজন আগরতলা এসেছে। তাদের সাথে আগেই তারা যোগাযোগ করেই এসেছে। আমরা সবাই একটা মাটির রাস্তা দিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম অনেকক্ষণ যাবার পর একটা স্কুলের মাঠের মতো বেশ বড় একটা জায়গা পেলাম। সেখানে মাঠের মধ্যে আমরা যার যার মতো করে রাত কাটালাম। মাঠের মধ্যে ইট-বালু-সিমেন্ট দিয়ে বেঞ্চের মত করা ছিল অনেকগুলো, আমি তার একটার উপর শুয়ে পড়লাম। ফজরের আযানের সময় উঠে দেখি শরণার্থীরা সবাই যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। আমিও তাদের সাথে রওয়ানা হলাম। আমরা উদয়নগর পৌছলাম, সেখানে গিয়ে বাসের দেখা পেলাম। বাসে উঠে বসলাম। প্রচন্ড খিদে পেটে। টাকা পয়সা বেশি নাই, আমার পকেটে আড়াইশো টাকার মতো আছে। তখনকার দিনে ১০০ টাকার পাকিস্তানি নোট দিলে ভারতীয় ১২০ টাকা দিত। আমি ১০ টাকা ভাঙ্গালাম, তাতে ভারতীয় ১২ টাকা পেলাম। ৫ টাকা গাড়ি ভাড়া দিলাম। এর পরের দুই ঘন্টা গাড়ি চলার পর আমরা আগরতলা পৌছলাম। আমরা যেখানে নামলাম তার নাম বটতলা স্টেশন। সেখানে আমি জিজ্ঞেস করলাম, ভাই বাংলাদেশের কোনো অফিস এখানে আছে কি? তারা বললো, জয়বাংলা থেকে এসেছেন? আমি বললাম, হ্যাঁ। (বাংলাদেশ হতে যারা যেত তাদেরকে তারা জয়বাংলা বলতো) তারা বললো, জয়বাংলা অফিস আছে সেখানে যান, আমি অফিসের মধ্য গেলাম। গিয়ে দেখি তৎকালীন আমাদের

নারায়ণগঞ্জ মহাকুমা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং বর্তমানের প্রধানমন্ত্রীর এসএসএফ বাহিনীর চীফ মেজর জেনারেল মুজিবুর রহমান সাহেবের পিতা বজলুর রহমান সাহেবকে (তিনি আমাদের নেতা ছিলেন), তিনি জয়বাংলা অফিসের চার্জে আছেন। আমি তাকে দেখে তার কাছে গিয়ে সালাম দিলাম। নেতা আমাকে দেখে বললেন, "বাচ্চু তুমি কি একাই আছো, নাকি তোমার সাথে আর কেউ এসেছে?" আমি বললাম, না ভাই আমি একাই এসেছি, বজলু ভাই বললেন, "তুমি সরাসরি বর্ডার থেকে এখানে আসছো?" আমি বললাম, হ্যাঁ ভাই সরাসরি এসেছি। আবার বজলু ভাই বললেন, তুমি কি কিছু খাইছো? আমি বললাম, না ভাই এখনো কিছু খাইনি, তখন উনি বললেন, ঠিক আছে এখানে বসো। উনি আমাকে খাবার দিলেন। আমি খুব তৃপ্তি সহকারে খেলাম। খেয়ে বজলু ভাইকে বললাম, ভাই আমি একটু রেস্ট নিব। বজলু ভাই বললেন, অসুবিধা নেই। তখন তিনি তার পিওনকে দিয়ে পাশে একটা রুমে আমাকে রেস্ট নিবার ব্যবস্থা করে দিলেন।

▶মানুষের খারাপ সময়ে কেউই তার হাত ধরে না, সবাই তার ভুল ধরে।

▶সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার ইচ্ছা যদি দুইপক্ষেরই থাকে, তবে সেই সম্পর্ক কেউ ভাঙতে পারে না।

ভারতীয় নাগরিকদের আতিথেয়তা

বজলু ভাইয়ের সান্নিধ্যে তিন-চারদিন কাটাবার পর তিনি আমাকে মেলাগড় ইয়ুথ ক্যাম্প এ পাঠিয়ে দিলেন। মেলাগড় ইয়ুথ ক্যাম্পে গিয়ে আমাদের আরেক নেতা এনাজুর রহমান চৌধুরী সাহেবকে পেলাম। তিনি সেখানকার মোটিভেটর হিসেবে ছিলেন। বেশ ভালই দিন কাটছিল। আমি আগরতলায় পৌঁছেছিলাম এপ্রিল মাসের ১৪ তারিখ। এপ্রিল মাস গেল, মে মাস পর্যন্ত আমরা ইয়ুথ ক্যাম্পে ছিলাম। ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা হচ্ছে। একদিন হঠাৎ মাখন ভাই এলেন ইয়ুথ ক্যাম্পে। মাখন ভাই আমাকে দেখে বললেন, "আপনি এখানে? দুলাভাইয়ের সাথে দেখা হয়েছে কি?" আমার ভগ্নিপতি তখন এমসিএ। উনি কসবার এমপি ছিলেন। দুলাভাইয়ের নাম সৈয়দ এমদাদুল বারী। আমি মাখন ভাইকে বললাম, দেখা হয়েছে। মাখন ভাই বললেন, আপনি এখানে কেন? আমি বললাম, এখান থেকে ট্রেনিং-এ যাব তাই অপেক্ষা করছি। মাখন ভাই বললেন, আপনার এখানে ট্রেনিং নেবার দরকার নেই, আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আপনি বিএলএফ এর ট্রেনিংয়ে দেরাদুন যাবেন। আমি বললাম, ঠিক আছে। আবার মাখন ভাই বললেন, তারিখ যখন হয় তখন আমি বলে দিব। দেরাদুনে তখন প্রথম ব্যাচ ট্রেনিং এ চলে গেছে, দ্বিতীয় ব্যাচে আমি রিক্রুট হলাম। মে মাসের ২২ অথবা ২৩ তারিখের দিকে বিকেল বেলা অফিসে গিয়েছি সেখানে থেকে বিদায় নেব এবং ওখান থেকে কিছু টাকা দেয় সেটা তুলব। অফিসে যাবার পর বজলু ভাই বললেন, "তুমি একটু বসো তোমার সাথে কথা আছে, আমি বললাম, সবাইকে বিদায় করছেন কিন্তু আমাকে বিদায় করলেন না কেন?" আমার ভিতর কাঁপুনি শুরু হয়ে গেল, সবাই বিদায় নিয়ে যাচ্ছে আমাকে বসিয়ে রেখেছেন কথা আছে বলে। এর কিছুক্ষণ পরে বজলু ভাই বললেন, 'তোমার তো দেরাদুন যাওয়া হবে না। তোমাকে কোলকাতা যেতে হবে, কোলকাতা থেকে মনির একটা মেসেজ পাঠিয়েছে। এই দেখ টেলিগ্রাম।' আমি দেখলাম, টেলিগ্রামে পরিষ্কার লেখা আছে আমাকে যেন কোলকাতা পাঠিয়ে দেয়া হয় এবং শিয়ালদহ একটা হোটেল আছে শ্রীনিকেতন, আমি যেন সেই হোটেলে উঠি। আমি বজলু ভাইকে বললাম, ভাই আমি যে যাব আমার কাছে তো খুব একটা টাকা নেই, সেখান পর্যন্ত যাব কিভাবে? বজলু ভাই বললেন, তুমি এটা চিন্তা করো না, আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। বজলু ভাই ব্যবস্থা করে দিলেন এবং পরের দিন রাত আটটায় আমাকে একটা ট্রাকে

উঠিয়ে দিলেন। তখন যাতায়াতের জন্য আগরতলা থেকে কোলকাতা পর্যন্ত তেমন কোনো ব্যবস্থা ছিল না। একমাত্র বিমান যাতায়াত করতো অথবা খণ্ড খণ্ড ট্রেনের মাধ্যমে যেতে হতো। আগরতলা থেকে তখন কোনো ট্রেন ছিল না। (কিছুদিন আগে ভারত বাংলাদেশ মৈত্রীর একটা দাওয়াত পেয়ে আগরতলা গিয়েছিলাম। এবার সেখানে গিয়ে দেখি আগরতলা শহর চেনাই যায় না, সেই ইট বিছানো রাস্তা আর নেই, পিচ ঢালা রাস্তা নেই। এখন বিরাট বিরাট চার লেনের রাস্তা, আগরতলাকে এখন আমার এমন মনে হয়েছে যে আমি যেন বোম্বে শহরে আছি। এখন ওখানে রেলস্টেশন আছে যেখান দিয়ে ভারতের সব স্থানে যাতায়াত করা যায়, আর আমাকে সেদিন রাতে ট্রাকে করে যেতে হয়েছিল ট্রেন স্টেশনের জন্য) যা-ই হোক সারারাত ট্রাক চললো। পাহাড়ের উপর দিয়ে উঁচু-নিচু ঢালুপথ। সকাল ৬.৩০ হবে তখন ধর্মনগর গিয়ে পৌঁছলাম, সেখানে ধর্মনগর রেল স্টেশন। ট্রেনে চড়লাম ওখান থেকে কোলকাতার ভাড়া ১৫ বা ১২ টাকা ছিল। ধর্মনগর থেকে ছেড়ে এসে দুপুরের পর পর লামড্রিন জংশনে পৌছালো, লামড্রিন নেমে সেখান থেকে পরবর্তী ট্রেন পাঁচটায় ছাড়বে। সেটিতে উঠে বসলাম। লামড্রিন থেকে আসলাম গোহাটি, তখন রাত সাড়ে আটটা বা নয়টা বাজে। গোহাটি থেকে ট্রেন বদল করে উঠলাম শিলিগুড়ির ট্রেনে। পরের দিন সকালে শিলিগুড়ি এসে নামলাম। আটটার সময় শিলিগুড়ি থেকে কোলকাতার ট্রেন, উঠে বসলাম কোলকাতার ট্রেনে। আমি তখন দুই দিন, রাত ধরে খণ্ড-খণ্ড ট্রেন জার্নি করে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। অবশেষে রাত সাড়ে আটটায় ট্রেন শিয়ালদহ স্টেশনে পৌঁছল। শিয়ালদহ স্টেশনে নেমে প্ল্যাটফর্মের বাইরে যাওয়ার জন্য আমি হাঁটছি। তখন দেখি একটা লোক জোরে জোরে হেঁটে আমার দিকে আসছে। আমি খুব ক্লান্ত ছিলাম। আমার বেশভূষা দেখে তিনি আমাকে চিনতে পেরেছেন। তিনি বললেন, "জয় বাংলা? জয় বাংলা?"। আমি বললাম, হ্যা। তিনি বলেন, আসুন, আসুন। ব্যাগ দেন, ব্যাগ দেন। আমি বললাম, না আপনাকে ব্যাগ দেবো কেন? তিনি বললেন, কোথায় যাবেন আপনি? আমি বললাম, এখানে একটা হোটেলে উঠবো। তিনি বললেন, হোটেলে ওঠার দরকার নেই, চলেন চলেন আমার সাথে। আমি বললাম, 'না ভাই আমি আপনার সাথে যাব না।' তখন লোকটা বললেন, ভাই কিছু মনে করবেন না, আমার বাবা শরণার্থী হিসেবে এখানে এসেছেন, তবে আমার বাবা বাঙ্গালিদের উপর কি অত্যাচার হচ্ছে তা দেখে এসেছেন। আজকে তিনদিন যাবত আমার বাবা আমাকে

শিয়ালদহ স্টেশনে পাঠাচ্ছেন এই বলে যে, আমার দেশের মানুষ অত্যন্ত অসুবিধায় আছে, তুমি তাদেরকে নিয়ে আসো। যাকে পাবে তুমি তাকে সাথে করে নিয়ে আসবে। আমাদের বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করবে তাদেরকে। ভাই আজ তিনদিন যাবত এখানে আসছি এবং সবাইকে দেখি তাদের ফ্যামিলিসহ আসছেন আর সকলেরই আত্মীয়-স্বজন এখানে আছে। তিন দিন পর আজ আপনাকে পেলাম তাই আপনি হোটেলে পরে উঠবেন, আজকে অন্তত আমার বাবাকে শান্তি দেন। আমি বললাম, আপনার বাংলাদেশে বাড়ি কোথায়? তিনি বললেন, ঢাকা। আমি বললাম, ঢাকা কোথায়? তিনি বললেন, নারায়ণগঞ্জে। আমি আবার বললাম নারায়ণগঞ্জ কোথায়? তিনি বললেন, আপনি নারায়ণগঞ্জ চিনেন। আমি বললাম, হ্যাঁ আমার বাড়িও নারায়ণগঞ্জেই। তিনি বললেন নারায়ণগঞ্জে কালির বাজারে আদর্শ মিষ্টান্ন ভান্ডার আছে না, আমি বললাম, হ্যাঁ, আছে সেটার মালিক তো মধু কুড়ি, তিনি বললেন, সে আমার বাবা, তিনিই আমাকে পাঠিয়েছেন। তখন আমি বললাম তাহলে তার সাথে তো আমার দেখা করতেই হবে। ভদ্রলোকের নাম ছিল দীপক বাবু। তিনি গাড়ি নিয়ে এসেছিলেন। আমি গাড়িতে করে তাদের বাড়ি গেলাম শিয়ালদহ স্টেশন থেকে প্রায় ২০/২২ কিলোমিটার দূরে যাদবপুর। উনাদের বাড়িতে খুব ভালোভাবে দুই দিন পার করলাম। এরপরে বললাম, দাদা আমাকে তো যেতে হবে, তা না হলে আমার জন্য ওরা চিন্তা করবে, দাদা বললেন ঠিক আছে, যাও কিন্তু একটা কথা তুমি রাখবে, তুমি কিন্তু কষ্ট করবে না তুমি কোলকাতায় যে ক'দিন আছো মুক্তিযুদ্ধে যতদিন না যাও, সে কদিন তুমি আমার এখানে থাকবে। আমি তাকে কথা দিয়ে শিয়ালদহ ফিরে আসলাম, এসে খুঁজে বের করলাম শ্রীনিকেতন হোটেল। হোটেলের ম্যানেজার এর সাথে দেখা করার পর ম্যানেজার বললেন, আপনার নাম কি মিজানুর রহমান বাচ্চু? ঢাকা থেকে এসেছেন, এখন আগরতলা থেকে আসছেন? আমি বললাম হ্যাঁ। তিনি বললেন, আপনার নামে তো হোটেল বুক করা আছে দুদিন আগে থেকেই। তিনি বেয়ারাকে ডেকে বললেন ১৫ নম্বর রুমে নিয়ে যাও। আমি বেয়ারার সাথে গিয়ে ১৫ নম্বর রুমে উঠলাম। বেয়ারা আমাকে বলল, আপনি এখানে থাকেন। আমরা খাবার দাবার সবকিছু আপনাকে দিব। কোন অসুবিধা হলে আমাদের জানাবেন এবং আপনার লোক এসে আপনাকে নিয়ে যাবে। আমি থাকলাম ওখানে। কিছুক্ষণ পর আমি একটু খোঁজ খবর নেবার জন্য নিচে গেলাম, নিচে গিয়ে দেখি ওদের ক্যাশ কাউন্টারে বসে

আছেন আমাদের আরেক নেতা ফনিভূষণ মজুমদার। নেতা খালি গায়ে শুধু একটা ধুতি পড়ে বসে আছেন। আমি উনার কাছে গিয়ে উনাকে নমস্কার দিলাম। উনি আমাদের মন্ত্রী ছিলেন, উনি সকলের সাথে আপনি করে কথা বলতেন। তখন উনার বয়স ৬০ বা ৬৫ হবে, আমার বয়স ২২/২৩ বছর। উনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কোথা থেকে এসেছেন? আমি বললাম, আমিতো নারায়ণগঞ্জ থেকে এসেছি। তিনি বললেন, আচ্ছা, আচ্ছা। আপনি নারায়ণগঞ্জ থেকে এসেছেন, আপনাদের শামসুজ্জোহা কেমন আছেন? আমি বললাম, উনি ভালই আছেন। উনি এখন আগরতলাতে আছেন।

তিনি বললেন, কারো কোন অসুবিধা হয় নাই তো? আমি বললাম, না কারো কোন অসুবিধা হয় নাই। সবাই ঠিকঠাক মতো আছেন। আবার তিনি বললেন, এখানে আপনি কত নম্বারে আছেন? আমি বললাম ১৫ নম্বরে, তখন তিনি হোটেলের লোকদের জিজ্ঞেস করলেন, এই আমাদের মিজান সাহেব কত নম্বরে? ওরা উত্তর দিল ১৭ নম্বরে। তিনি আমাকে বললেন আপনার পাশে ১৭ নম্বরে আমাদের মিজানুর রহমান চৌধুরী সাহেব আছেন আরো অনেকেই এখানে আছেন, আপনি পাবেন তাদের। আমি আর দেরি না করে উপরে উঠে গিয়ে দেখি মিজানুর রহমান সাহেবকে, তিনি আরো লোকদের নিয়ে কথা বলছেন। আমি সালাম দিয়ে কাছে গেলাম (মিজানুর রহমান চৌধুরী সাহেব আমার বেয়াই হতেন) তিনি আমাকে দেখে বললেন, 'আরে তুমি এখানে কবে এসেছো? আমি বললাম, এসেছি দুদিন আগেই, কিন্তু হোটেলে এসেছি আজকে। তিনি বললেন, আচ্ছা, আচ্ছা, খাওয়া দাওয়া করেছো, আমি বললাম এখনও করি নাই তবে ব্যবস্থা আছে, আমি করে নিবো। আমি একটু আপনার সাথে দেখা করে গেলাম, এই বলে আমি সেখান থেকে এসে দেখি ১৯ নম্বরে আবু সুফিয়ান সাহেব এবং শ্রমিক নেতা আব্দুর রহমান সাহেব। আবু সুফিয়ান সাহেব হলেন এখনকার খুলনার মন্ত্রী মুন্নুজান সুফিয়ান এর স্বামী। উনাদের সাথে আলাপ-আলোচনা করে খুব শখ্যতা হয়ে গেল। এখানে দুই দিন কেটে গেল। তৃতীয় দিন আমার রুমে এসে হাজির ক্যাপ্টেন সুলতান সাহেব। ক্যাপ্টেন সুলতান সাহেবের সাথে আমার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সময় পরিচয় ছিল, গণঅভ্যুত্থানের সময় উনার সাথে আমার সম্পর্ক আরো গাঢ় হয়েছে। আমি উনাকে দেখে বললাম, সুলতান ভাই আপনি এখানে? সুলতান ভাই বললেন, তোমাকে নিতে এসেছি, আমি বললাম আপনি কি টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন, সুলতান

ভাই বললেন না, মনির তো আমার কাছে আছে, মনিরই তোমাকে খবর পাঠিয়েছে। আমাদের ছাত্র নেতা মনিরুল ইসলাম ভাই তিনি আমার বড় ভাই, সুলতান ভাই বললেন তুমি ব্যাগ গোছাও যেতে হবে আমার সাথে, আমি আর দেরি না করে গুছিয়ে নিলাম। কারণ, আমিও যাওয়ার জন্য উদগ্রীব ছিলাম। তারপর সুলতান ভাইয়ের সাথে জীপে করে রওয়ানা হলাম। ৬ থেকে সাড়ে ছয় ঘন্টা পরে এসে উত্তর চব্বিশ পরগনার বসিরহাট থানার একেবারে ইছামতি নদীর পাড়ে বাকুন্ডি ক্যাম্প, সেখানে এসে পৌঁছালাম। অপর পাড়ে আমাদের বাংলাদেশের দেবহাটা থানা। ক্যাম্পে হাজির হওয়ার পরে ট্রেনিংয়ের জন্য উনাদের সাথে উপস্থিত হলাম, আমার জায়গাটা হল ক্যাপ্টেন সাহেবের তাবুর মধ্যেই মনির ভাইও সেখানে থাকেন।

- যে ব্যক্তি যতো সৎ তার কষ্টও ততো বেশি।

স্মৃতির পাতার কিছু না বলা কথা

“আজ বেলা শেষে কত স্মৃতি মনে পড়ে যায়”

আজ মুক্তিযুদ্ধের যুদ্ধক্ষেত্রের কিছু বলবো না। আজ মুক্তিযুদ্ধের সাথে জড়িয়ে আছে এমন একটা ঘটনা তোমাদেরকে বলবো। আমরা মুক্তিযুদ্ধে যারা অংশগ্রহণ করেছিলাম তারা বাংলার জনগণ, শ্রমিক, কৃষক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, দিনমজুর, ছাত্র-শিক্ষক সহ সব পেশাজীবী লোক। বিডিআর, আর্মি, পুলিশ, গ্রাম্য পুলিশ, আনসার, সবারই অংশগ্রহণ ছিল। প্রত্যেকে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছে, এর মধ্যে যারা অসীম সাহসের পরিচয় দিয়েছে তাদেরকে তৎকালীন বাংলাদেশ সরকার (যুদ্ধের পরে যে বাংলাদেশের শাসনভার গ্রহণ করে) বিভিন্ন উপাধি দিয়েছিল। এর মধ্যে ৭ জনকে বীরশ্রেষ্ঠ, ১০৩ জনকে বীরউত্তম উপাধি দিয়েছিল এবং তৃতীয় যাদেরকে সম্মানিত করেছেন তাদেরকে বীর বিক্রম উপাধী দিয়েছিল। সংখ্যাটি সঠিক বলতে পারবো না, এরপর যে খেতাবটি ছিল, সেটা ছিল বীর প্রতীক। আজকে আমি তোমাদেরকে বলছি ৫০ বছর আগে মুক্তিযুদ্ধের কথা, আজকে আমি বার্ধক্যে উপনীত হয়েছি। এই বার্ধক্যে এসেও আমি মনে প্রাণে এই যুদ্ধের স্মৃতিগুলো লালন করছি। আমি নিজের মাঝে ধরে রেখেছি। আমি বাংলার মানুষের অসীম সাহস দেখেছি। অন্যায়ের বিরুদ্ধে কিভাবে বাংলার মানুষ অসীম সাহসের পরিচয় দিয়েছেন সেটাও আমি দেখেছি। এবং ঠিক সময় মতো একজন বলিষ্ঠ নেতা আমরা পেয়েছিলাম। তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙলি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। উনি প্রত্যেকটি বাঙালিকে একই পাল্লায় উঠাতে পেরেছিলেন। তাঁর নির্দেশেই বাংলার আপামর জনসাধারণ, আবাল বৃদ্ধ জনতা, বৃদ্ধ থেকে কৈশোর পর্যন্ত যারা ছিলেন, তাঁর ডাকে জীবনকে তুচ্ছ মনে করে যুদ্ধে পশ্চিমা বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। আজকে আমি এমন একজন যোদ্ধার কথা বলবো - যিনি বাংলাদেশের ইতিহাস সৃষ্টি করে গেছেন। তোমরাও তার জন্য দোয়া করো। উনি খুব করুণভাবে আমদের থেকে বিদায় নিয়েছেন। যে তার জীবনকে তুচ্ছ করে, তার গ্রুপের প্রত্যেকের জীবন তিনি রক্ষা করেছেন এবং নিজের জীবন বিসর্জন দিয়ে তার গ্রুপটা রক্ষা করেছিলেন। ১০৩ জন বীর উত্তম উপাধি পেয়েছেন। এর ভেতর ১০২ জনই ছিলো সেনাবাহিনীর লোক, একমাত্র একজনই ছিলো সিভিলিয়নের মধ্য থেকে, ছাত্রদের মধ্য থেকে উনি বীর উত্তম

খেতাব পেয়েছেন। আমি তাকে স্যালুট জানাই। আমাদের বাংলাদেশের তথা বাংলা মায়ের উনিই গর্ব। তোমরা যারা নতুন প্রজন্ম আছো তোমাদেরও উনি গর্ব।

আমার সৌভাগ্য হয়েছিলো তার দেখা পাবার। সে ঘটনাটি আমি তোমাদেরকে বলছি। ১৯৫৮ সালের ডিসেম্বর মাস। আমি প্রাইমারি স্কুল থেকে পাস করেছি, পঞ্চম শ্রেণী থেকে পাস করে আমি হাই স্কুলে ভর্তি হয়েছি। আমার স্কুলের নাম নারায়নগঞ্জ বার একাডেমি। ১৯৫৯ সালের জানুয়ারীতে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হবার পরে আমি প্রথম প্রথম খুব উৎসাহ নিয়ে স্কুলে গিয়েছি। হাইস্কুলের ছাত্র আমি, ওখানে গিয়ে একটা ছেলের সাথে আমার পরিচয় হয়। পর্যায়ক্রমে তিন চার মাসের মধ্যে ছেলেটার সাথে এমন নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে, যে প্রাইমারি স্কুলে যাদের সাথে পড়েছি, তাদের থেকে বেশি সম্পর্ক হয়ে যায় ঐ ছেলেটির সাথে। সম্পর্কটা এমন, আমি যদি একটু দেরি করে স্কুলে যেতাম, সে আমার জন্য জায়গা রাখতো, আমরা পাশাপাশি বসতাম। এজন্য আমার প্রাইমারি স্কুলের যারা সহপাঠী ছিল, আমার এলাকার যারা ছিল, তারা মনে মনে হিংসাই করতো। ওর সাথে আমার এতো সুসম্পর্ক কেনো! যাক আমার অন্যান্য বন্ধু বান্ধবের চোখের ভাষা বুঝতাম, ব্যবহার বুঝতাম। কিন্তু জানিনা ওকে আমারও ভালো লাগতো। কালো খাটো মতো ছেলেটা, মাথার চুল নিগ্রোদের মতো কালো। স্কুল থেকে অল্প দূরে আমার বাড়ী। আমি স্কুল থেকে খেতে আসলে, আমার সাথে সেও আসতো। খাওয়ার পরে মা দুধ খেতে দিতো দু'জনকে। কিন্তু আমার ছোটবেলা থেকে অভ্যাস ছিল, আমি দুধ খেতাম না আর ও দুধ খেত। এজন্য মা আমার সাথে অনেক রাগারাগি করেছে। মা বলে, এক সাথে চলিস, ও যা করে তুই তা করতে পারিস না? ও দুধ খায়, তুই খাস না কেন? আমি চুপ করে থাকতাম, কিছু বলতাম না। এভাবে তার সাথে আমার একটা নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এতদিন শুনেছি, তার বাড়ি নোয়াখালীতে। তার বাবা এখানে চাকরির নতুন স্থানে বদলি হয়ে এসেছিলো। তিনি সেটেলমেন্ট অফিসের ম্যানেজার ছিলেন, তার সাথে এসে সে এখানে ভর্তি হয়েছে। আমার সাথে সে ক্লাস সিক্সে পড়তো। ১৯৬০ সালে সে সেভেনে, ১৯৬১ সালে যখন সে এইটে উঠলো, তখন তার বাবা এখান থেকে চলে গেলো। যখন সে চলে যায়, তখন আমাকে ধরে অনেক কান্নাকাটি করল আর বললো যে, মিজান আমি তো চলে যাচ্ছি। কিন্তু তোর সাথে আমার কোনোদিন যোগাযোগ বন্ধ হবে না। আমি যোগাযোগ করবো। তার একটা বড় ভাইও এখানে পড়তো, তার নাম ছিল কামাল উদ্দিন। আমি এখন পর্যন্ত আমার বন্ধুটির নাম বলিনি। তার নাম হচ্ছে নিজাম

উদ্দিন। ঠাট্টা করে আমার অন্যান্য বন্ধু বান্ধব বলতো, খাজা নিজাম উদ্দিন। আলআমিন আমার আরেক বন্ধু সে রাজউকের সহকারী প্লানার ছিল। সে এখন অবসরে আছেন, অসুস্থ অবস্থায় বাসাতেই আছেন। নারায়ণগঞ্জ সুধীজন পাঠাগারের সেক্রেটারী ছিল। সে বলতো, "খাজা নিজাম উদ্দিন আউলিয়া।" অনেকে আউলিয়া বলতো, অনেকে খাজন বলতো। যাহোক, তার ভাই কামাল উদ্দিন আমাদের এক বছরের সিনিয়র ছিলো। আমার বন্ধুটি ক্লাস এইটে উঠে চলে গেল, তবে ছাত্র হিসাবে খুব একটা ভালো ছিল না। মাঝারি মেধার ছাত্র ছিল সে। ১৯৬৪ সালে এসএসসি পাশ করলাম, ১৯৬৮ সালে কলেজ থেকে বের হলাম। ১৯৬৯ সালে গণআন্দোলনে যোগ দিলাম। প্রচন্ডভাবে জড়িয়ে পড়লাম। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের সময় আমার দুলাভাই কসবা থেকে মনোনয়ন পেয়েছিলেন, তা আগেই আপনাদের জানিয়েছি। আমি ওনার নির্বাচন নিয়ে ব্যস্ত। একদিন নির্বাচন চলাকালীন সময় ওখান থেকে আমার বাসায় আসি নারায়ণগঞ্জে। খবর পেয়ে আলামিন আসলো বাসায়, এসে বললো, মিজান, খাজন তো এসেছিলো। আমি বললাম কোন খাজন? ও বললো, আউলিয়া খাজা নিজাম উদ্দিন এসেছিলো। তোকে পায়নি তাই আমার কাছে একটি চিঠি দিয়ে গেছে। চিঠিটা হাতে নিয়ে পড়লাম। লেখা ছিল মিজান অনেক বছর হয়ে গেল তোর সাথে দেখা নাই, খুব আশা নিয়ে আলআমিনের সাথে এসেছিলাম, তোর সাথে দেখা করবো বলে। কিন্তু এসে শুনি তুই এখানে নাই, বি-বাড়িয়াতে আছিস। যাক, আমি সময় করে আবার আসবো। তুই যদি ঢাকা যাস তাহলে, মুহসিন হলের ৪৪২ নম্বর রুমে আছি। আমার সাথে দেখা করিস। পত্রটা পড়ে মনটা খুব আপ্লুত হলো। সে এতদিন পরে এসেছে, পত্র দিয়েছে, অবশ্যই আমি দেখা করবো। নির্বাচন শেষ করে ৭১ এর জানুয়ারি বা ফেব্রুয়ারি মাস হবে, আমি গেলাম মুহসিন হলে। মুহসিন হলে গিয়ে ৪৪২ নম্বর রুমটা খুঁজে বের করলাম। গিয়ে দেখি তিন চারটা ছেলে রুমের মধ্যে, গিয়ে বললাম ভাই, 'এখানে কি খাজা নিজাম উদ্দিন থাকে? বলল, হ্যাঁ, আসেন, ভিতরে বসেন। আপনার পরিচয়? আমি বললাম আমি তার ছোট বেলার বন্ধু, আমার বাসায় ও গিয়েছিল কিন্তু আমাকে পায় নাই, এই জন্য আমি তার সাথে দেখা করতে এসেছি, ওরা বললো ভাই সে তো আধা ঘন্টা আগে বাড়িতে রওনা হয়ে গেছে, আপনি কমলাপুর ষ্টেশনে গেলে পাবেন, সে গ্রীনএ্যারো ট্রেন ধরবে।আমি তাড়াতাড়ি করে ওখান থেকে নেমে রিকসা নিয়ে ষ্টেশনে গেলাম। গিয়ে শুনি পাচঁ মিনিট আগে ট্রেন ষ্টেশন থেকে বের হয়ে গেছে। ওকে পেলাম না, ব্যার্থ মনে ফিরে এলাম।

এরপর মার্চ মাসে তার সাথে দেখা করবো, সে সময় আর সুযোগ পেলাম না। দেশে আন্দোলনের হাওয়া বইতে শুরু করলো। এরপর ২৫ মার্চের ঘটনা ঘটলো, আমি ঢাকায় যুদ্ধে চলে গেলাম। তার আর কোনো খোঁজ খবর নেয়া হল না। এরপর বাকুন্ডী ক্যাম্পে আমি ট্রেনিং শেষ করেছি, এখন আমি একজন ট্রেইনার। মুক্তিযোদ্ধা যারা আসে, তাদের ট্রেনিং দেই। মুক্তিযুদ্ধের সময়, বাংলাদেশিদের পক্ষে প্রবাসীদের জন্য খবরের কাগজ বের হত, সাপ্তাহিক পেপার, নাম "মুক্তি বানী"। আমার ঠিক মনে নাই সেপ্টেম্বর মাসের ৭/৮ তারিখ হবে আমি পেপারটা নিয়ে পড়ছি, প্রথম পৃষ্ঠার ডান পাশে দেখি বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে মারা গেলেন নিজাম উদ্দিন। আমি তার ছবিটা দেখে হতভম্ভ হয়ে গেলাম। তোমরা চিন্তা করতে পার আমার অবস্থাটা তখন কি? আমি চুপ করে রইলাম। কারও সাথে যে কথা বলবো সেই অবস্থা ছিল না। ৫০ বছর পর আজও ভুলতে পারিনি আমার সেই ছোটবেলার বন্ধুকে। কথাটা আমি আজ এখানেই শেষ করতে চাই না। আরো কিছু তোমাদের জানাতে চাই, আমি দাবি করতে চাই তোমাদের কাছে এরপর তার ঠিকানা আমি আর খুঁজে পাইনি। আমি যাদুঘরে গেলাম, যারা শহীদ হয়েছে এই যুদ্ধে, খেতাব প্রাপ্ত তাদের লিস্ট টা চেয়েছিলাম। কিন্তু তখন ওরা আমাকে দিতে পারল না। ওরা বললো যে, "আমরা এখনও লিস্ট পাইনি, আচ্ছা মন্ত্রণালয় থেকে আসুক তখন পাবেন"। পাবেন, পাবেন করে ২০০২ কি তিন সাল হবে, পেপারে মধ্যে ছবি, আজ নিজাম উদ্দিনের এত তম মৃত্যুবার্ষিকী, ৪ ঠা সেপ্টেম্বর সে মারা গিয়েছেন। ঐখানে দেখি তার ঠিকানা, গ্রামের বাড়ি মালাপাড়া, উপজেলা হচ্ছে ব্রাহ্মণপাড়া, কুমিল্লা। আমি মালাপাড়া, ব্রাহ্মণপাড়া আগেও গিয়েছি। মালাপাড়া উপজেলা হওয়ার আগে এটা বুড়িচং থানা ছিল। ৭০ এর নির্বাচন আমি কসবায় করেছি। এমএনএ ক্যান্ডিডেট ছিল, আইন মন্ত্রীর বাবা সিরাজুল হক সাহেব (বাচ্চু) মিয়া, ওনার নির্বাচন করেছি। আর বুড়িচং এমপি পদে দাড়িয়ে ছিলেন আমির হোসেন সাহেব, কসবায় দাড়িয়ে ছিলেন আমার দুলাভাই এমদাদুল বারী সাহেব। তাদের নির্বাচন করেছি তাই এলাকাটা আমার পরিচিত। ঠিকানাটা পাওয়ার পর আমি আর দেরি করতে পারলাম না। আমার এক বন্ধুকে বললাম, তোর গাড়ীটা আমার দরকার গাড়ীটা আমাকে দে। গাড়িটা নিয়ে ঠিক সাথে সাথে আমি রওয়ানা হয়ে গেলাম। আজকে তার মৃত্যুদিন এই উপলক্ষে দোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। আমি যাব, ময়নামতি ক্যান্টনমেন্ট থেকে খুব একটা দূরে নয়। আমি খুঁজে খুঁজে গেলাম গোমতি নদীর পাড়ে মালিপাড়া গ্রামে। সেখানে তার নামে একটা স্কুল

করেছে স্থানীয়রা। নাম "শহীদ নিজাম উদ্দিন শিশু শিক্ষা কানন"। সে আর কোন দিন আমাদের কাছে কিছু চাইতে আসবে না। আমরা তাকে আর কিছু দিতেও পারবো না। যেখানে তাকে কবর দেয়া হয়েছে তার নামে ঐ জায়গাটার নাম "নিজাম নগর"। স্কুলটার অবস্থা তেমন ভালো নয়। স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধারা কিছু কিছু সহযোগীতা করে স্কুলটি চালায়। আমি সরকারকে অনুরোধ করছি স্কুলটির উন্নয়নের জন্য।

- এই পৃথিবীতে বিশ্বাসের কেউ দাম দেয় না, যদিও কেউ দিয়ে থাকে তবে তার সংখ্যা অতি নগন্য।

দেশকে ভালোবেসে কতটুকু ত্যাগ করতে পারে দেশের সোনার সন্তানরা?

দেশকে ভালোবেসে কতটুকু ত্যাগ স্বীকার করতে পারে দেশের সোনার সন্তানরা, একবারও কেউ ভাবেনি তারা তাদের নিজেদের জন্য, একবারও ভাবেনি কত বড় নেতার ছেলে তারা শুধু দেশের মানুষের কথা ভেবেই যুদ্ধে নেমেছিলো সবাই।

আজকে তোমাদের আমি ক্যাম্পের কথা শোনাবো। আশা করি তোমরা কোন বিরক্ত প্রকাশ করবে না। যারা আমার আগের ধারাবাহিকগুলো পড়েছো তারা জানো আমি কবে ক্যাম্পে প্রবেশ করেছিলাম, মে মাসের শেষ সপ্তাহে। এখানে আমি ট্রেনিং নিয়েছি, ট্রেনার হিসেবে কাজ করেছি। এখন আমার দেশের ভিতরে যাবার পালা। অক্টোবর মাসে আমি মোটামুটি প্রস্তুতি নিলাম যে ভিতরে আসবো, কোন দলের সাথে আসবো কাদের সাথে আসবো সেটাও চুড়ান্ত হয়ে গেল। ফরিদপুরের সাব সেক্টর কমান্ডার ছিলেন ক্যাপ্টেন বাবুল সাহেব, উনার আসল নাম নূর মোহাম্মাদ, উনি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামি ছিলেন। অত্যন্ত বিপ্লবী মনের একজন মানুষ এবং অত্যন্ত স্বাধীনচেতা লোক। উনি আমাকে বললেন, বাচ্চু তুমি আমার সাথে চলো। ওনার ব্যক্তিত্বে অভিভূত হয়ে আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম আমি উনার সাথে যাব। আমাদের দিন, তারিখ ঠিক। আজকে রাতের বেলায় রওয়ানা দিব। ঠিক বিকেল বেলা ক্যাপ্টেন সুলতান উদ্দিন সাহেব বললেন, 'বাচ্চু তোমার তো আজকে যাওয়া হবে না।' কেন স্যার যাওয়া হবে না কেন? আমার অসুবিধা কি? তিনি বললেন, দেখ মেজর সাহেব আমাকে হেডকোয়ার্টারে ডেকে নিয়েছিলেন, একটা ভিআইপি টিম আসছে। আমি বললাম ভিআইপি টিম মানে কিসের টিম? তিনি বললেন, একটা দল আসছে যারা বর্তমান প্রবাসী সরকার চালাচ্ছে তাদেরই সন্তানেরা, আর তোমাকে এদের ট্রেনিং দিতে হবে। আমি বললাম, আমার মনটা যুদ্ধের ফিল্ডে যাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে আছে, আমাকে আর আটকিয়েন না। তিনি বললেন, দেখ এটা সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছে তোমাকে এটা করতে হবে। কি আর করবো ভাঙ্গা মন নিয়ে রয়ে গেলাম। ক্যাপ্টেন বাবুল ভাইও আমাকে বোঝালেন, তুমি যুদ্ধে গেলেও যুদ্ধ করবা আর এখানে তুমি যুদ্ধের সৈনিক তৈরি করবে এটাও একটা বড় যুদ্ধ। এটাও তোমার কাজ, ডিউটি তো ডিউটিই। সেক্টর কমান্ডার যখন

যেটা বলবে সেটা শুনতে হবে। আমি রয়ে গেলাম। পরের দিন দল আসলো, দলের মধ্যে দেখি নারায়নগঞ্জের আমাদের নেতা তখনকার এমএনএ শামসুজ্জোহা সাহেবের বড় ছেলে নাসিম ওসমান, দলের মধ্যে দেখলাম বঙ্গবন্ধুর ভাই শেখ নাসের সাহেবের ছেলে শেখ হেলাল, দলের মধ্যে দেখলাম আব্দুর রব সেরনিয়াবাতের এক ছেলে, ক্যাপ্টেন মুনসুর সাহেবের ছেলে, আরো কয়েকজন ভিআইপিদের সন্তান। এরা দলে আট জন । ঠিক আছে পরের দিন ট্রেনিংয়ের জন্য তাদের কে নিয়ে বসেছি। তাদের বুঝাচ্ছি, তাদের কি কি করতে হবে, তাদের কি কি ট্রেনিং নিতে হবে। তখন আমি নাসিম ওসমানকে ডেকে বললাম, নাসিম তুমি যে এসেছো তোমর আব্বা জানেন? ও বললো, 'না আব্বা তো আগরতলায় আছে'। আমি বললাম, তুমি যে ট্রেনিংটা দিতে এসেছো সেটা কি তুমি জানো? ও বললো, হ্যা আমি জানি, আমি মনে মনে বললাম তুমি যখন জেনেই এসেছো আমার কিছু বলার নেই। তারা সুইসাইড স্কোয়াডের প্রশিক্ষণ নেবে বলে এখানে এসেছে। যাক, তাদের দুইটা দায়িত্ব আমার উপর বর্তিত হয়েছে, একটা হচ্ছে তাদেরকে সকাল বেলা আমাকে পিটি করাতে হবে, ২য় টা হচ্ছে তাদেরকে আমার এক্সপ্লোসিভ ট্রেনিং দিতে হবে। কিভাবে মাইন তৈরী করতে হয়, সেট করতে হয়, আর বাকি অস্ত্র ট্রেনিং যা আছে তা আর্মিদের ট্রেনাররা তাদের দিবে। ২য় দিন আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে শেষ করে ৩য় দিন যখন ট্রেনিং শুরু করেছি তখন আমার চোখে পড়লো শেখ হেলালকে। একটা বাচ্চা ছেলে, বয়স ১১ বছর হবে। আমি বললাম, কোন ক্লাসে পড়ো? ও বললো, ক্লাস সেভেনে পড়ি। আমি বললাম, তোমাকে তো আমি ট্রেনিং দিব না। এই ট্রেনিংটা তুমি নিওনা তুমি বাইরে থাক। তাকে আর আমি সাথে নিলাম না। তখন সে তার এক আত্মীয়র কাছে গেল, সে ক্যাম্পের সাথেই থাকতো। বঙ্গবন্ধুর আত্মীয়। বঙ্গবন্ধুর টুঙ্গীপাড়া বাড়ির সাথেই বাড়ি, তার নাম শেখ ফরিদ। আমরা তাকে ফরিদ নানা বলে ডাকতাম। ভদ্রলোক অত্যন্ত ভালো ছিলেন। কথাবার্তায় আমাদেরকে মাতিয়ে রাখতেন এবং হায়ার অফিসিয়াল যারা আসতেন তাদের থেকে আমাদের সুযোগসুবিধা দেবার জন্য আগবাড়িয়ে কথা বলে অনেক কিছুর সুযোগ করে দিতেন এবং ওনাকে সকলে খুব প্রাধান্য দিতেন। আমরা ওনাকে বেশ মান্য করতাম। পরে শেখ হেলাল ফরিদ নানাকে নিয়ে আসলো। ফরিদ নানা বললেন, কি নানা তুমি ওকে ট্রেনিং দিবা না কেন? আমি বললাম, না নানা আমি এতটুকু বাচ্চাকে এই ট্রেনিং দিতে পারবো না অসুবিধা আছে। তিনি

বললেন, দাও নানা, ওকে প্রধানমন্ত্রী পাঠিয়েছে। আমি বললাম, পাঠাক প্রধানমন্ত্রী, কিন্তু এই ট্রেনিংটা নেবার সে উপযুক্ত না। উনি আর কোনো তর্ক না করে গিয়ে ক্যাপ্টেন সাহেবকে নিয়ে আসলেন। ক্যাপ্টেন সাহেব এসে বলেলন, বাচ্চু তুমি তাকে ট্রেনিং দাও। আমি বললাম, না ভাই আমি যে তাকে ট্রেনিং দিব এখানে ডেটনেটর আছে, কখন গিয়ে ডেটনেটরে টিপ লেগে যায়, পুরো বিষ্ফোরক দ্রব্য আছে সব ব্লাষ্ট হয়ে যেতে পারে। তখন সকলের জীবন বিপন্ন হবে আমারও জীবনের নিরাপত্তা থাকবে না। একটা বাচ্চা ছেলে ও। বুঝবেও না কোনটা থেকে কোনটা টিপ দিয়ে ফেলবে। টাইম পেনসিলে টিপ দিতে গিয়ে সে ডেটনেটরে টিপ দিয়ে বসবে, না তাকে ট্রেনিং দেয়া যাবে না, আমি এটা পারবো না। সুলতান সাহেব খুব কম কথার মানুষ ছিলেন। উনি দেখলেন তর্কে তর্ক বেড়ে যাবে, আমি নাখোশ হয়ে যাবো। উনি আর কিছু বললেন না। উনি ফরিদ নানা ও শেখ হেলালকে নিয়ে বাইরে চলে গেলেন। বিকেল বেলা দেখি সেক্টর কমান্ডার মেজর জলিল সাহেব আসছেন। আসার পর আমাকে ডাকালেন, তিনি বললেন, "দেখ বাচ্চু এটাতো হাই অফিসিয়াল অর্ডার, তুমি তাকে ট্রেনিংটা দাও"। আমার কেন যেন জিদ চেপে গিয়েছিল। আমি এদের জন্য রয়ে গেলাম, আমি এখনো যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে পারলাম না, অক্টোবর মাসও চলে যাচ্ছে। ওই জিদে জিদে বলে ফেললাম না স্যার আমি দিব না। তখন মেজর জলিল বললেন, "দেখ দিস ইজ ইয়োর সেক্টর কমান্ডার্স অর্ডার।" মাথাটা নিচু করে থাকলাম। সুলতান ভাই আমাকে বললেন, আসো। মেজর জলিলকে বললেন, ঠিক আছে স্যার ওকে আমি বুঝাচ্ছি। ট্রেনিং তাদের শেষ করলাম। সাকসেসফুলভাবে প্রত্যেকটা ছেলে অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে ট্রেনিং নিল। এদের একজনেরও মাথায় চিন্তা আসলো না যে আমি রাষ্ট্রপতির ছেলে, আমি প্রধানমন্ত্রীর আত্মীয়, আমি বঙ্গবন্ধুর আত্মীয়, এসব কিইছু না, কতক্ষণে তারা দেশের জন্য নিজের জীবনটা বিলিয়ে দেবে সে ভেবে অত্যন্ত মনযোগ দিয়ে ট্রেনিংটা নিয়েছিল। এদের মধ্যে নাসিম ওসমান মারা গিয়েছে, আল্লাহ তাকে বেহেশত নসিব করুন, সৈয়দ আশরাফের ইমিডিয়েট ছোট ভাই এক কলেজের শুনেছিলাম অধ্যক্ষ ছিলেন। উনি বেঁচে আছেন, শেখ হেলাল বেঁচে আছে, আর বর্তমান গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া পৌরসভার মেয়র শেখ মির্জা, বাচ্চা ছেলে ছিল সেও বেঁচে আছে, আজকে তারা নামকরা হয়েছে। কিন্তু স্বাধীনতার জন্য তাদের প্রত্যেকের অবদান আছে। সে অবদানটা কি? তারা নিঃস্বার্থভাবে দেশের জন্য

জীবন দিতে গিয়েছিল। তারা কোন কিছুর বিনিময় না, কোনো লোভে না, তারা বাঙ্গালির অধিকার আদায়ের জন্য বাংলার মায়ের মান ও সম্ভ্রম রক্ষার জন্য। বাংলার জনগণের স্বাধীনতার জন্য, বাঙ্গালিদের স্বার্থে তারা জীবন বিসর্জন দেওয়ার জন্য সাধারণ জনগণের সাথে মিশে গিয়ে ট্রেনিং নিয়েছিল যুদ্ধ করবে বলে। তারা ওখানে পোলাও মাংস দাবী করে নাই। তারা তো মুরগি না হলে খাবো না–এটা বলে নাই। তারা তো তখন ভাল কাপড় পরার জন্য চিন্তা করে নাই। সাধারণ জনগণের কাতারে বসে সকাল বেলা দুটো রুটি আর এক বাটি ডাল, দুপুর বেলা একটু ভাজি একটুখানি ভাত, রাতে দুটো রুটি, ডাল আর ভাজি এই খেয়েই চলেছে। তাদের মন তো তখন একটুও বিদ্রোহ করে নাই। তারা একটু চিন্তাও করে নাই সোনার চামচ মুখে নিয়ে আমরা জন্মগ্রহণ করেছি, আমরা কেন এখানে কষ্ট করবো? আমাদের জন্য ভালো খাবার দিতে হবে। আমরা বর্তমানের প্রবাসি রাষ্ট্রপতির ছেলে, আমরা বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর আত্মীয়, আমরা বঙ্গবন্ধুর আত্মীয়। তোমরা এগুলো চিন্তাও করতে পারবে না। আজকে দেশের মধ্যে একটু নেতৃত্ব পেলেই বর্তমান নেতাদের যে অবস্থা হয় কাপড়ের মধ্যে ধুলো লাগতে দেন না, সাধারণ মানুষের সাথে হাত মিলাতে চায় না হাতে ময়লা লাগবে বলে, এই বিষয়গুলো আমি তখন তাদের মধ্যে দেখিনি। তারা যাদের সন্তান ছিলো এই বাংলাদেশের জন্য তারা তাদের প্রাণ দিয়েছে আজীবন বাংলার স্বাধীকারের জন্য তারা বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আন্দোলন করে গিয়েছেন তাদেরকে আমি স্যালুট দেই। তাদের থেকে আমরা শিখেছি, এখনও তাদের চরিত্রকে আমরা অনুসরণ করে চলেছি, জানিনা আমাদের এই বক্তব্যে আগামী প্রজন্ম সংশোধন হবে কি না। আমার অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধা ভাইয়েরা যারা আছেন তারা যদি যে স্পীড নিয়ে, বাংলার জনগণের অধিকার আদায়ের জন্য যেভাবে জীবন বিলিয়ে দিয়েছিলেন, বাংলা মায়ের সম্ভ্রম রক্ষার জন্য যে ত্যাগ করেছিলেন আজ যদি একটু মুখটা খোলেন নতুন প্রজন্মকে যদি তা বলতে পারেন, নতুন প্রজন্মকে যদি সেই চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে পারেন, তবে আমার মনে হয় আগামী দিনগুলো আমাদের সন্তানদের জন্য অত্যন্ত সুখকর হবে।

ঠিক যেন বাংলাদেশ থেকে একটা নক্ষত্র খসে পড়ে গেল

আজকে তোমাদের যে ঘটনা বলবো এই ঘটনাটা আমার মনে করো না, কারণ যখন এই ঘটনা আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে তখন আমার খুব কষ্ট হয় এবং দু-তিন দিন আমার মনটা খুব খারাপ থাকে। এজন্য এটা আমি কারো সাথে আলাপ করি না, বলতেও চাই না। সেটা হচ্ছে বাকুন্ডি ক্যাম্পের ঘটনা। আমি যখন ট্রেনার হিসেবে ছিলাম ওখানে যারা নতুন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আসতো তাদেরকে ট্রেনিং দিতাম। ট্রেনিং এর পর সকাল বেলা পিটি করাতাম। দুপুর বেলা কোন কোন দিন আমার ভাগ্যে পরত রাইফেল চালানো, কোন কোন দিন পরত আবার গ্রেনেড ট্রেনিং করানো, আবার তাবুতে তাদেরকে মোটিভেট করতে হতো। এরপর সন্ধ্যার পর কোনো কাজ থাকত না, তখন কোন কোন সময় অফিসে বসে অন্য ট্রেনারদের সাথে আলাপ করতাম। সামরিক বাহিনীর যারা ছিলেন তাদের সাথে আলাপ করতাম অথবা নিজের তাবুতে বসে আমার ক্যাপ্টেনের সাথে আলাপ করতাম। আবার বের হয়ে প্রত্যেকটা তাবুর বাইরে দিয়ে পজিশনটা দেখে আসতাম, যারা নাইট ডিউটি দিচ্ছে তারা কি অবস্থায় আছে, প্রত্যেকটা তাবুর হাল-হকিকত কেমন, কোনো অসুবিধা আছে কি-না কোনো অসন্তোষ আছে কিনা এগুলো ঘুরে দেখতাম। একদিন আমি তাবুতে ঘুরছি হঠাৎ শুনি একটা বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ আসছে। স্বাভাবিকভাবেই কৌতুহল হলো, এখানে কোন বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ তো আসার কথা না। এরপর যে তাবু থেকে আওয়াজ আসছে সে তাবুটা লক্ষ্য করে গেলাম। ওখানে তখন অবস্থান করছিল খুলনা কমার্স কলেজের ভিপি শাহনেওয়াজ জামান আজাদ। স্বাধীনতার পর ঢাকা ভার্সিটির ফিলোসফি ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম খালেক, এরা ওই তাবুর মধ্যে থাকতেন। তার তাবুর মধ্য থেকে বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ আসছে। আস্তে আস্তে গিয়ে আমি তাবুটার বাইরে গিয়ে দাঁড়ালাম। দেখি বাদ্যযন্ত্র যেটা বাজাচ্ছে একটা টিনের কৌটা। কৌটার মুখটা ফেলে দিয়েছে, টিনের মধ্যে কাঠি দিয়ে তার বেঁধে একতারা বানিয়ে বাজাচ্ছে।

খুব সুন্দর সুমধুর কণ্ঠে একটা ছেলে গান গাচ্ছে। দেশাত্মবোধক গান। এই গানটা জীবনে সেদিনই প্রথম শুনি। “গেরিলা, গেরিলা, আমরা গেরিলা, আমরা নবীন প্রাণ, গাই চেগুয়েভেরার গান, আমরা নবীন প্রাণ, গাই মার্কস-লেলিন এর গান। বঙ্গবন্ধুর

চিন্তাধারায় আমরা বলিয়ান। গেরিলা, গেরিলা, আমরা গেরিলা, গানটা আমার এত ভালো লেগেছে আমি দাড়িয়ে অনেকক্ষণ গানটা শুনলাম। শোনার পর আমি আস্তে করে সরে গেলাম। কারণ, তারা যদি আমাকে দেখে ফেলে তাহলে গানটা বন্ধ করে দিবে। তাই ঠিক আছে গান গাচ্ছে গাক। তাবুটা তো ছেড়ে আসলাম আমি। পরের দিন আজাদ ভাইকে বললাম, ভাই আপনার তাবুতে গান গায় কে? আপনি কি শুনেছেন? আমি বললাম, আমি কাল সন্ধ্যার পর গিয়েছিলাম খাওয়ার পর বাইরে থেকে শুনলাম। আছে একটা বাচ্চা ছেলে, অনেক ভালো ভালো দেশাত্মবোধক গান গায়। সালাম ভাই আমার তাবুতে একটু পাঠান না। বলল, আচ্ছা ঠিক আছে পাঠিয়ে দিচ্ছি। ছেলেটা আসলো ১৩/১৪ বছর বয়স হবে, ছোট-খাটো দেখতে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমার নাম কি? বলল, শ্যাম দাস। কোন ক্লাসে পড়ো? ক্লাস এইটে পড়ি, এইটে পড়ো তুমি আসছো এখানে? আমাদের এলাকায় আর্মিরা ঢুকেছে এবং খুব অত্যাচার করছে। গ্রামের সবাই চলে গেছে তাই, মার সাথে আমিও চলে আসছি। তোমার বাড়ি কই? মুন্সীগঞ্জ। মুন্সিগঞ্জ থেকে এখানে আসলে? হ্যাঁ, আমরা মাওয়া দিয়ে এসেছি এবং ভোমরা বর্ডার দিয়ে আমরা পার হয়েছি। বারাসাতে আমার মামার বাড়ি তাই আমরা এদিক দিয়েই এসেছি। তারপর মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার জন্য অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু অল্প বয়স দেখে আমাকে বাদ দিয়ে দিয়েছে। পরে আমি একজনের সাথে এই ক্যাম্পে এসেছি। অনেক ঘোরাঘুরির পর যার সাথে এসেছি সে আমাকে ট্রেনিংয়ের জন্য নিয়েছে। এরপর তাকে আমি ডেকে এনে প্রায়ই তার গান শুনতাম। দেশাত্মবোধক গান ছাড়া সে অন্য গান গাইতে চাইতো না। অপূর্ব গলা! তো কিছুদিনের মধ্যে আমাদের এখানে সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তারা যারা ট্রেইনার ছিলেন সবার খুব আদরের পাত্র হয়ে গেল। বেশিরভাগ আমার সাথেই এটা ওটা করতো এক দিন আমাকে বলল, স্যার একটা কথা বলবো। আমি বললাম, বলো আপনি যখন ভিতরে যাবেন তখন আমাকেও সাথে নিয়েন। আমি আর কারো সাথে যাব না এরপর যখন আমি ভিতরে ঢুকলাম সুন্দরবন এ এসে আমি ওখানে ক্যাম্প করলাম। একটা বেড়িবাধের একপাশে টেম্পোরারি একটা ক্যাম্প করলাম। ওখানে সে আমার সাথে আসলো, থাকতো আশেপাশে। কিছু রাজাকার ছিল আমাদেরকে খুব বিরক্ত করা শুরু করল। গ্রেনেড চার্জ করত, গোলাগুলি করত তাদের জন্য আমরা একটা ফাঁদ পাতলাম, আমরা আমাদের এই ক্যাম্পটাকে তিনটা ভাগে ভাগ করে নিলাম। একদিন আমরা

খবর নিলাম, আমাদের থেকে এক দেড় কিলোমিটার দূরে এখানে তাদের একটা ক্যাম্প আছে। আরেকটা মোংলা পোর্টের সাথে আছে, তো আমরা এখন চিন্তা করলাম আমরা ওদের ক্যাম্প আক্রমণ করব। আমার সাথে বেঙ্গল রেজিমেন্টের কিছু অসীম সাহসী যোদ্ধা ছিলেন ওদের সাথে বসে একটা প্ল্যান করলাম, আমরা ৮/৯ জন একটা রাজাকারের ক্যাম্প আক্রমণ করব। সন্ধ্যার পরপরই আমরা সেই ক্যাম্পের দিকে রওয়ানা হয়েছি। ওরা ক্যাম্প করেছে একটা শাখা নদীকে সামনে রেখে, যাতে আক্রমণটা সুন্দরবন এর দিক থেকেই হবে। সুন্দরবনের যেদিক দিয়েই মুক্তিযোদ্ধারা ঢুকবে সে দিক দিয়েই হবে। তারা এদিকটা সামনে রেখে পিছনে অনেক দূর গ্রাম, মাঝে বিল রেখে খুব সেইফ জায়গার মধ্যে তারা ক্যাম্প করেছে। যাতে চারিদিকের যেখান থেকে উঠুক দেখা যাবে, নদীটা খুব একটা বড় না, শাখা নদী। এপার ওপার গুলি রেঞ্জার মাঝেই আমরা চিন্তা করলাম ওদেরকে পাড়ে থেকেই আমরা আক্রমণ করব। কিন্তু আমাদের সাথে এক আর্মির হাবিলদার ছিলেন উনি বললেন যে এখান থেকে আক্রমণ করে কিছুই করতে পারব না তাদেরকে। তাদের যদি কিছু ক্ষতি করতেই হয় তবে নদী পার হয়ে ওপারে যেতে হবে। ঠিক আছে আমরা নৌকায় করে নদী পার হলাম। আমরা ৯ জন সেই শ্যামল ছিল আমার সাথে, আমরা দুজন আর সাতজন সেনাবাহিনীর বেঙ্গল রেজিমেন্টের, আমরা বেশ দূর থেকে নদী ক্রস করে পার হয়ে প্রায় হাফ কিলো হেঁটে গিয়ে একদম ওদের ক্যাম্পটাকে পুরোপুরি আমাদের পজিশনে আনলাম।

এরপর অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর আমরা আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিলাম এবং সেই হাবিলদার ছিলেন। উনি ক্রোলিং করে সামনে গেল, আমাদেরকে বললো আসতে। এখানে একটা কথা বলে রাখি শ্যামল ট্রেনিংএ গ্রেনেডটা খুব ভালো থ্রোইং করতে পারত। সে আমার সাথে আছে, তাকে অন্য কোন অস্ত্র দেয়া হয়নি। তার সাথে কোমরের মধ্যে জড়ানো বেশ কয়েকটা গ্রেনেড রাখা আছে। ওখানে যাওয়ার পর সিগনাল পাওয়ার পরপরই সেই হাবিলদারের প্রথম ফায়ার ওপেন করল। আমাদের চারজনের হাতে থাকা রাইফেল একজনের কাছে একটা এলএমজি ছিল ফায়ার শুরু হল। সাথে সাথে শ্যামল একটা গ্রেনেড চার্জ করল। সে বিশাল ভয়াবহ অবস্থা। এদিকে সামনে চিল্লাচিল্লি শুরু হয়ে গেল। আশে পাশে এরমধ্যেই উভয় পক্ষের গোলাগুলি শুরু হয়ে গেল। আমি নিচে শুয়ে গুলি চালাচ্ছি এর মধ্যেই শ্যামল ওদেরকে কখন আরেকটা গ্রেনেট চার্জ করেছে, আমি দেখি নাই। কিন্তু সে

থ্রো করতে পারে নাই। আমার গোলাগুলির এক ফাঁকে আমি শ্যামলকে বলছি, শ্যামল গ্রেনেড চার্জ করো, গ্রেনেট চার্জ করো কোন সাড়া নাই। আমার মেজাজটা খুব খারাপ হয়ে গেছে, আমি কতবার বললাম গ্রেনেড চার্জ করো না।" এরপর তাকে দেখি উপর হয়ে পজিশন নিয়ে আছে। আমি বললাম শ্যামল গ্রেনেড চার্জ করো, কোন কথা নাই। এরপর আমার হাতে রাইফেল। আমি যখন তাকে পায়ে পা দিয়ে ধাক্কা দিয়েছি, দেখি গড়িয়ে পড়ে গেছে। ব্যাপারটা কি? আমি আশ্চর্য হলাম। এরপর যা হোক আমাদের গোলাগুলিতে আমাদের সাথে যাদের গ্রেনেড ছিল গ্রেনেড চার্জ করার পর ওরা জায়গা ত্যাগ করে চলে গেল। পাঁচটা লাশ আমরা ওখানে পেলাম আহত অবস্থায় **১১** জনকে আমরা ওখান থেকে ধরলাম। কিন্তু আমি দেখলাম শ্যামলের নিথর দেহ, তার প্রাণ নাই। উঠিয়ে দেখি সে ঠিক কপাল বরাবর রাজাকারদের গুলি খেয়েছে, ওর বডিটা নিয়ে আমরা আসলাম।

আসার পর ওর রক্তে সব ভিজে গেছে। লুঙ্গি পরা ছিল গ্রেনেডগুলো রাখার সুবিধার্থে। তার পকেটে ছোট একটা কাগজ পেলাম তাতে লেখা, স্যার আমি মারা গেলে আমার খবরটা মায়ের কাছে পৌঁছে দিয়েন।

আমার ঠিকানা খুব সম্ভব কুমারপাড়া বা দাসপাড়া এরকম কিছু একটা হবে মুন্সিগঞ্জে, ঠিক আছে, আমরা পরের দিন তার লাশটা পাঠিয়ে দিলাম, ওপারে যাওয়ার পর ওখানেই তাকে দাহ করেছে, সৎকার ওখানেই করেছে। ওর আত্মীয় স্বজনের কাছে লাশটা ফেরত দিতে পেরেছে কিনা জানিনা, আমরা লাশ পৌঁছে দিয়েছি হিঙ্গলগঞ্জ আমাদের আরেকটা ক্যাম্পে। হিঙ্গলগঞ্জ থেকে তারা হেডকোয়ার্টারে পৌঁছে দিয়েছে, এরপর তার পরের খবর আমি জানিনা। স্বাধীনতার পর, অনেকদিন পরে আমার একটা কিউরিসিটি জাগলো, যাইনা মুন্সীগঞ্জে, একটু গিয়ে কুমারপাড়ায় খুঁজে বের করি, নব্বইয়ে এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে আমি মুন্সিগঞ্জ গেলাম। যদিও আমার বাড়ি থেকে খুব বেশি দূরে না, কিন্তু যাওয়া হয়নি। ওখানে গেলাম মনের মধ্যে একটা কৌতুহল যদি পেয়ে যাই তার মাকে বা তার আত্মীয়-স্বজন তাহলে একটু দেখে আসলাম। ওরা বললো, এটা তো অনেক আগের। হ্যাঁ এই গ্রামটা ভেঙে পদ্মায় নিয়ে গেছে। এখন আর এটার কোন অস্তিত্ব নাই। ঠিক বাংলাদেশের মানচিত্র থেকে খসে পড়লো যেভাবে, না থাক না সেভাবে শ্যামল ও আমাদের মধ্যে থেকে হারিয়ে গেল কিন্তু তার স্মৃতিটা রেখে গেল। আজকে বাংলা মায়ের কত সন্তান বঙ্গবন্ধুর ডাকে উদ্বুদ্ধ হয়ে পাগল হয়ে এই যুদ্ধে

প্রাণ দিয়েছে তার সংখ্যা কে জানে? পাগলের মত গিয়েছে কেউ বলে যায়নি। প্রত্যেকে বলেছে যে, মা তুমি দোয়া করো আমি যেন বিজয়ী হয়ে ফিরতে পারি, প্রত্যেকে নাকি তার মাকে বলেছে বা আত্মীয় স্বজনকে বলেছে দোয়া করবেন যাতে দেশের জন্য আমরা জান দিতে পারি। আজ তোমরা স্বাধীনতা ভোগ করছো, তোমাদের কাছে অনুরোধ, এই যে নাম-না-জানা কত পথে-প্রান্তরে স্বাধীনতার জন্য কত লোক, কত বীর সেনা জীবন দিয়েছে তাদেরকে একটু স্মরণ করো, তাহলে তাদের আত্মা শান্তি পাবে। আজ এ পর্যন্তই, জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, জয় হোক বাংলার জনগণের।

- যে ব্যক্তি যত সৎ তার কষ্টও তত বেশি।
- বিশ্বাস আর নিশ্বাস হারিয়ে গেলে ফেরৎ আসে না।

বহুত পার্থক্য রয়েছে সেকাল আর একালের রাজনীতিবিদদের মধ্যে

বহুত পার্থক্য রয়েছে সেকাল আর একালের রাজনীতিবিদদের মধ্যে। তাদের কথা না বললেই নয়। যারা তাদের সাথে ছিল শুধু তারাই নিজ চোখে দেখেছেন তাদের চাল-চলন ও তাদের চরিত্র কেমন ছিল।

চলার পথে বিভিন্ন স্থানে আমাদের বাংলাদেশের তৎকালিন অনেক নেতার সাথে আমার দেখা হয়েছে, তারা দেশের জন্য তখন কি করেছে, নিজেকে কিভাবে বিলিয়ে দিয়েছে, আমি যদি তোমাদের কাছে বর্ণনা না করি আমার বলার অনেক কিছুই অপূর্ণ রয়ে যাবে, সাথে সাথে যাদের দ্বারা এই মুক্তিযুদ্ধটা সফলতা লাভ করেছিলো যাদের দ্বারা মুক্তিযোদ্ধারা অনুপ্রাণিত হয়ে দেশটাকে স্বাধীন করার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো, সুশৃঙ্খলভাবে যারা প্রশিক্ষণ নিয়ে দেশে এসে যুদ্ধের মাধ্যমে দেশটা স্বাধীন করেছিলো, এদের পিছনের শক্তিটার কথা যদি আমি না বলি তবে আমার বলাটা অনেক খানি অপূর্ণই রয়ে যায়। পূর্বেই উল্লেখ করেছি, আমি আগরতলা পৌঁছার পরই সেখানে নারায়নগঞ্জ মহাকুমার তৎকালিন সাধারন সম্পাদক, বর্তমান এসএসএফ এর প্রধান মেজর জেনারেল মুজিবুর রহমানের পিতা বজলুর রহমান আমাদের প্রিয় বজলু ভাইকে ওখানে গিয়ে পাই। সারাটা দিন এবং রাতেও তিনি প্রচুর কাজ করেছেন, সিষ্টেম কে রক্ষার জন্য ২ নং সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধারা যারা ওখানে গিয়ে যোগাযোগ করেছেন তাদের একজনের সাথেও উনি বিরক্ত প্রকাশ করেন নাই। ২৪টা ঘণ্টাই উনি কাজে ব্যস্ত থাকতেন। আমি দেখেছি, যে চেয়ারে বসে উনি কাজ করতেন সেই চেয়ারে বসেই উনি রাতে ঘুমাতেন। যখনই ডাকা হতো ওনাকে পাওয়া যেত। আমি উনার ওখানে কিছুদিন থেকেছি। আমি বলেছি, আমি মেলাগড়েও ট্রেনিং এর জন্য কিছুদিন ছিলাম, এর মাঝে আমি এসে আগরতলার বটতলায় সুব্রত হোটেল নামে একটা হোটেল ছিল, সেটা কাঠের দোতালা। সেখানে কয়েকটা দিন আমি থেকেছি। আর ২নং সেক্টরের আন্ডারে যে জেলাগুলি পড়েছে এখানকার এমপি, এমএনএদের জন্য ত্রিপুরা রাজ্য সরকার তাদের উপজাতিদের জন্য কারিগরি শিক্ষার জন্য যে স্কুলটা ছিল সেটা বরাদ্দ দেয়। ওই হোষ্টেলের মধ্যে ওই জোনের এমপিরা যারা আগে এসেছেন তারা উঠেছেন, যার রুম বরাদ্দ পেয়েছেন তারা ওখানে ছিলেন, এটা ডিস্ট্রিবিউশনের দায়িত্বে ছিলেন তৎকালিন বিবাড়িয়ার জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি এ্যাডঃ আলি আজম

সাহেব। উনি এমএনএ ছিলেন তো উনি এবং সৈয়দ এমদাদুল বারি সাহেব ওনারা দুজন এটা ম্যানেজ করতেন। ওখানে দেখেছি চেনা জানার মধ্যে আমাদের নেতা নারায়নগঞ্জের কৃতি সন্তান ভাষা সৈনিক তৎকালিন এমএনএ শামসুজ্জোহা সাহেবকে। ওখানে ছিলেন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের প্রাক্তন সভাপতি ফেরদৌস কোরায়শী সাহেব, আরো অনেক এমএনএরা। সুব্রত হোটেলে থাকতেন আমাদের নারায়নগঞ্জের আর এক কিংবদন্তী আলী আহমেদ চুনকা সাহেব, আর থাকতেন প্রখ্যাত শ্রমিক নেতা আওয়ামীলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির নেতা জহুর আহমেদ চৌধুরী সাহেব। ওনারা সুব্রত হোটেলে থাকতেন। ছোট্ট ঘর, ১৫ টাকা করে ঘর ভাড়া, পাটাতনের উপরে ঘর এটার মধ্যে ওনারা থাকতেন। চুনকা সাহেবকে দেখেছি ওনার ওখানে কি শরণার্থী, কি মুক্তিযোদ্ধা ছেলেরা আসতো সবাই এসে ওনার সাথে যোগাযোগ করতো, সবার খবর নিতেন তারা যেন কষ্ট না করে তারা যেন ঠিক জায়গামত পৌঁছাতে পারে এই ব্যবস্থাটা উনি করতেন। উনি অকাতরে দিতেন সকলকে, তার কাছ থেকে খালি হাতে কেউ ফেরত যেত না। নারায়নগঞ্জের হিন্দু সম্প্রদায়ের সাথে ভালো সম্পর্ক ছিল তার, তাদের প্রিয় পাত্র ছিলেন। ওখানে যারা গিয়েছিল বা ওখান থেকে উনি যেভাবেই হোক খবর পাঠিয়ে টাকা আনতেন, এবং আগরতলায় বসে যারা ওখানের ব্যবসায়ী ছিল, নারায়নগঞ্জের সাথে আগে আগরতলার যোগাযোগ ছিল তাদের মাধ্যমে নারায়নগঞ্জ থেকে টাকা নিতেন, আমি নিজে দেখেছি অনেকের কাছ থেকে হাওলাত করেও উনি মুক্তিযোদ্ধাদের দিতেন। তখনকার যে সংকট তা মিটাতে উনি কোন চিন্তা করেন নাই। এই টাকাগুলো ফেরত দিতে হবে দেশটা স্বাধীন হলে, কত টাকা ধার হচ্ছে এসবের কোন হিসাব উনি করেন নাই। এক দিন আমি কথায় কথায় বললাম, ভাই কত টাকা আপনি দিচ্ছেন, ধার করছেন ইনশাল্লাহ দেশটা একদিন স্বাধীন হবে টাকাগুলিতো শোধ করতে হবে তার চিন্তা আছে আপনার? কিভাবে যে শোধ করবেন? বললো, দেখ কিছু না থাকলেও আমার বাড়িটা তো আছে, আমি এটা বিক্রি করে হলেও তাদের টাকা দিয়ে দেব, এসব নিয়ে তুই চিন্তা করিস না। আজকে উনি প্রায়াত আমি আল্লাহর কাছে ওনার আত্মার মাগফেরাত কামনা করি। ওনার সাথে ছিলেন জহুর আহমেদ চৌধুরী সাহেব, একজন অতি উঁচু মাপের লোক ছিলেন উনি, একজন শ্রমিক নেতা। যারা তার সাথে না মিশেছে, যারা তাকে না দেখেছে, না চলেছে, তারা তার সম্পর্কে কোন চিন্তাও করতে পারবে না। উনি কানে একটু কম শুনতেন,

আমি তাকে নানা বলে ডাকতাম, উনি আমাকে নাতির মতো স্নেহ করতেন, আমি তার সাথে খুব ঠাট্টা-মস্করা করতাম। আমি ওখানে থাকতেই কঠিন একটা রোগ তাদের ধরে গেল দুজনের একসাথেই। আলি আহমেদ চুনকা ও জহুর আহমেদ চৌধুরী সাহেবের, তারা পাশাপাশি রুমে থাকতেন। আমাশা ধরে বসলো, আমাশাটা এমন কঠিনভাবে রূপ নিল যে অনবরত পায়খানার সাথে রক্ত যেতে থাকলো। রক্ত আমাশা হয়ে গেল। চুনকা ভাইর চেহারার দিকে তাকানো যায় না, আমি বললাম, ভাই ডাক্তার যে পথ্য দিচ্ছে তা তো আপনি হোটেলের মধ্যে পাবেন না, উনি বললেন কি করবি দেখ একটুখানি, তখন আমার বোন ছিলেন সৈয়দ এমদাদুল বারী এমপি সাহেবের ওয়াইফ, আমার মেঝ বোন ওনাক গিয়ে আমি বললাম, আমাদের নারায়নগঞ্জের অত্যন্ত একজন স্বনামধন্য ব্যক্তি আমাদের নেতা আলি আহমেদ চুনকা সাহেবের এই এই অসুবিধা। তো দুলাভাইকে বলে একটা রুম এলোটমেন্ট করে দাও ওনাকে, যাতে ওনাকে আমি নিয়ে আসতে পারি, তুমি কয়টা দিন ওনাকে একটু খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করবা। ঠিক আছে দুলাভাইকে বলার পর একটা রুম উনি দিলেন, চুনকা ভাইকে নিয়ে গেলাম, নিয়ে গিয়ে ওখানে রাখার পরে জহুর আহমেদ সাহেব আমাকে বললেন নাতি তুই আমার কোন ব্যাবস্থা করবি না? আমি বললাম, হ্যাঁ চলেন, চুনকা ভাইকে এসে বললাম ভাই চৌধুরী সাহেবের অবস্থা তো খুব খারাপ, আপনার পাশেই রাখি। তিনি বললেন, ঠিক আছে নিয়ে আয়। এনে দিলাম আমার বোন একেবারে আপন ভাইয়ের মতো ওনাদের আমাশার যে পথ্য তার সাথে ওষুধ চললো এবং খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে কন্ট্রোল করলেন। আল্লাহর রহমতে এক সপ্তাহের মধ্যে দুজনের অবস্থা ভালো হয়ে গেল। তখন ওনারা ওখানে রয়ে গেলেন, ওখানে আমার সাথে একদিন দেখা হলো ফেরদৌস কোরায়শীর সাথে। উনি কোন রুম পান নাই সিড়ির নিচে একটা চৌকি পেতে এর উপরে থাকতেন, করুন অবস্থা ছিল তখন তার। যাহোক সবার সাথে সবার সহযোগীতা ছিল। তখন মানুষের জন্য, বাংলার সন্তানদের জন্য, বঙ্গবন্ধুর যে নির্দেশ ছিল বঙ্গবন্ধুর সান্নিধ্যে ওনারা নেতা হয়েছেন। ওনারা সব সময় চেয়েছেন বঙ্গবন্ধুর চরিত্রের আদলে নিজেদেরকে গড়তে, সেই কঠিন সময় সেই যুদ্ধের সময় আমি তাদেরকে দেখেছি জনগণের পাশেই তারা ছিলেন। এরপর কোলকাতা আসার পর আমার সাথে কিছু ভালো লোকের সাথে পরিচয় হয়েছিল, ওখানে এসে প্রথম পরিচয় হলো ফরিদপুরের আর এক প্রবীন নেতা ফনি ভূষণ মজুমদারের সাথে।

দাদা বলে ডাকতাম, দাদা অমায়িক লোক ছিলেন, আপনি করে সবার সাথে কথা বলতেন, দাদাকে দেখেছি আওয়ামীলীগের কর্মি হলেই ওখানে এসেছে হোটেল ভাড়া দিতে পারে না বা গাড়ি ভাড়া নেই যাবে, দাদাকে দেখেছি কোচড় থেকে বের করে তাদেরকে টাকা দিতেন। যতদুর সম্ভব হয়েছে দিয়েছেন কিন্তু খালি হতে কেউকে উনি ফেরত দেন নাই। ২০ টাকা, ৩০ টাকা, ৫০ টাকা উনি অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছেন। ওখানে আমার সাথে একজন ভদ্রলোকের সাথে দেখা হয়েছিল তিনি ছিলেন বর্তমানে প্রতিমন্ত্রী খুলনার মুন্নুজান সুফিয়ানের স্বামী আবু সুফিয়ান সাহেবের সাথে, ভদ্রলোক অনেক শিক্ষিত ছিলেন। তিনি অধ্যাপক ছিলেন, ব্যবহার ছিল মধুর। শুদ্ধ ভাষায় কথা বলতেন শ্রমিক নেতা রহমান সাহেব সব সময় ওনার সাথে ছিলেন। শ্রমিকদের সমস্যার সমাধান কিভাবে করবেন সারাদিন এগুলো নিয়েই উনি ব্যস্ত থাকতেন। ওখানে দেখেছি মিজানুর রহমান চৌধুরী সাহেবকে। আর এক ভদ্রলোক, ওখানে জমিদারের মতো চলছেন অকাতরে টাকা জোগাড় করে, হাওলাত করে সাহায্য করেছেন মানুষকে। কোনদিন তাকে বিরক্ত প্রকাশ করতে আমি দেখি নাই। আমি যখন ট্রেনিং ক্যাম্পে ছিলাম বাকুন্ডি ক্যাম্পে ওখানে আমার সাথে ছিলেন তৎকালিন জেলা আওয়ামীলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক প্রখ্যাত ছাত্রনেতা মনিরুল ইসলাম মনির ভাই। যিনি বিএনপি কর্তৃক আওয়ামীলীগ অফিসে নিহত হন। আওয়ামীলীগ নেতা আজ যারা আমরা বার্ধক্যে উপনীত হয়েছি, আমরা তার হাত ধরেই রাজনীতিতে এসেছি। মনির ভাই আমাকে বললেন একটু কোলকাতা যেতে হবে, কেন? হ্যা তুমি আমার সাথে চলো, বাকুন্ডি ট্রেনিং ক্যাম্পের কিছু সমস্যা নিয়ে উনি কোলকাতা আসলেন, মেজর জলিল সাহেবের যে জীপটা ছিলো, সে জীপটা চালাতো নারায়নগঞ্জের আর এক মুক্তিযোদ্ধা মুসলে উদ্দিন। তাকে নিয়ে আমরা কোলকাতা আসলাম পার্ক ষ্টেটে, কারনানি স্টেট একটা বিল্ডিং আছে সেখানে, নিচ তলায় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর, ছোট্ট একটা রুম দশ ফুট বাই দশ ফুট হবে রুমের ভিতর চারটা কাঠের চেয়ার, আর প্রধানমন্ত্রী বসেন একটা কাঠের চেয়ারে, দেখলাম ওনার পিছনে একজন শুতে পারবে এরকম একটা ছোট্ট চৌকি। যার মধ্যে একটা বালিশ আর পাশে দেখলাম একটা তেলের চুলা, হাড়ি পাতিল ও দেখলাম। কথায় কথায় উনি বললেন এখানে আমার নিজেরটা আমি নিজেই রান্না করে খাই। কথাটা তোমরা চিন্তা করতে পার? যে একজন প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী নিজের রান্না নিজে করে খান এবং অত্যন্ত সহজ সরলভাবে উনি ওনার

জীবন যাপন করেন। আমরা ওখানে যাওয়ার পর দেখি ওনার রুমের মধ্যে আর একজন ছিলেন তিনিও আমাদের পূর্ব পরিচিত, বর্তমানে যে বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ দিপু ওনার পিতা হামিদ সাহেব। উনি আমাদের সাথে আগে অনেক আন্দোলনে জড়িত ছিলেন। উনি উনসত্তুরের গণঅভ্যুত্থান এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আন্দোলনে আমাদের নারায়নগঞ্জের ব্যাচটার সাথে ওতোপ্রতোভাবে জড়িত ছিলেন। ওনাকে ওখানে গিয়ে পেলাম, কুশল বিনিময় হলো। উনি বিদায় নেয়ার পরে মনির ভাই ক্যাম্পের বিভিন্ন সমস্যা সম্মন্ধে কিছু দাবী তাজউদ্দিন সাহেবের কাছে উপস্থাপন করলেন। প্রধানমন্ত্রী কথা দিলেন বললেন, মনির আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সাথে আলাপ আলোচনা করে অনতিবিলম্বে তোমাদের ক্যাম্পের সমস্যাটা আমি দুর করে দেব। উনি কথা রেখেছিলেন। আমরা ক্যাম্পের মধ্যে যখন ট্রেনিং এ ব্যস্ত হঠাৎ করে একদিন এসে উপস্থিত হলেন তোফায়েল ভাই। তখন উনি বিখ্যাত ছাত্রনেতা। উনি এসে ক্যাম্পটা পরিদর্শন করলেন। সবার সাথে কুশল বিনিময় করলেন। এবং উনি বললেন ভারতবর্ষের যত ক্যাম্প আছে সবগুলি আমি পরিদর্শন করেছি, আমি দেরাদুনে গিয়েছিলাম সেখান থেকে আমি ২ দিন আগে এসেছি, তিনি যাওয়ার সময় আমাকে ডেকে হাঁটতে হাঁটতে আমার হাতে কিছু টাকা গুজে দিলেন। দেখলাম, দুইটা একশত টাকার নোট, বললেন এটা রাখ কাজে লাগবে। এরপর যার সান্নিধ্য আমরা ওখানে পেয়েছি তিনি ২/৩ বার আমাদের ক্যাম্পটা দেখে সকলের সাথে কুশল বিনিময় করে গিয়েছেন, বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গা থেকে ছাত্রলীগের কর্মীদের এনে উনি মুক্তিযুদ্ধে ভর্তি করিয়েছেন, তিনি হলেন আরেক স্বনামধন্য নেতা সিরাজুল আলম খান। আজকে এগুলো এক একটা বাস্তব ইতিহাস, সত্য ইতিহাস। আমি তোমাদের কাছে তুলে ধরলাম এবং এই চরিত্রটা স্বাধীন হবার পরের, ওনারা ক্ষমতায় আসার পর যিনি যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন তারা সেই চরিত্র আকড়ে ধরে ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর যত গুণ আছে এই গুণগুলি ওনারা ধারণ করে লালন করতেন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আগরতলার কথা, আলী আহমেদ চুনকার সাহেব ভোলেন নাই। চুনকা ভাই মৃত্যুর দুদিন আগেও আমাকে বলে গিয়েছেন, তুইতো আমার আপন ভাই, আমি আজও স্বরণ করি। অনেক দিন দেখা নেই, যুদ্ধ শেষ হয়ে গিয়েছে। যে যার বাসায় চলে এসেছি, বঙ্গবন্ধু এসে নতুন সরকার গঠন করেছেন, সেই সরকারের শ্রমমন্ত্রী হয়েছেন জহুর আহমেদ চৌধুরী সাহেব, ওনার বাড়ি চট্রগ্রামে, আমি একটু কৌতুহল

বশতঃ শ্রম মন্ত্রণালয় গেলাম ওনার সাথে দেখা করলাম, পিওন গিয়ে বললো নারায়নগঞ্জ থেকে ওমুক এসেছে, তখন তিনি পিওনের আগেই দৌড়ে এসে আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে ওনার সামনে বসিয়েছেন। আমি বললাম, “নানা কেমন আছেন?” তিনি বললেন, “বাদ দে কেমন আছি, আমি মন্ত্রী অহন তুই বোঝস না কেমন আছি? খুব ভালো আছি, কি খাবি এইটা ক? আমি বললাম, নানা আমি আপনার সাথে দেখা করতে এসেছি, কিছু খাব না। কয় না খাইতে হইবো।” পরে আমাকে বললো কি করিস? আমি বললাম নানা আমি কিছু করি না। চাকরির চিন্তা করছি, চাকরি খুঁজতাছি। বললেন, রাখ, ওনার সচিবকে ডেকে আমাকে সাথে সাথে একটা দরখাস্ত করতে বললেন। আমি করলাম, উনি আমাকে নিয়োগ দিলেন এমপ্লয়মেন্ট একচেঞ্জ এর কর্মকর্তা হিসেবে। উনি সাথে সাথেই আমাকে নিয়োগপত্র দিলেন। বললেন, যা চাকরি কর। ইয়োথ এমপ্লয়মেন্ট অফিসার হিসেবে। আমার পোষ্টিং হলো দিনাজপুর। মাত্র যুদ্ধ থেকে এসেছি, এতোদিন পরে দিনাজপুরে চাকরি করতে যাব? আমি আর গেলাম না। তোমরা চিন্তা করতে পার যুদ্ধের মাঠে ওনার সাথে পরিচয় কি উপকার করেছিলাম আমি এই তো? অসুস্থ হয়েছিল, আমি অসুস্থ মানুষটাকে একজনের হেফাজতে দিয়ে এসেছিলাম, ভোলে নাই ওনারা। আর আমরা? আমাদের চরিত্রটা দেখ, যারা আমাদের অনেক উপকার করেছেন নিজেরা যখন ক্ষমতায় বসেছি খবরও রাখিনি কার উছিলায় আজকে আমরা এখানে এসেছি, এটাই আমাদের চরিত্র। কিন্তু আমি যাদের দেখেছি আজও বেঁচে আছেন তোফায়েল সাহেব যিনি প্রত্যেকটা কর্মীকে আপন ভাইয়ের মতো দেখেন। এরাই নেতা, আমি তার দীর্ঘায়ু কামনা করি। আজকে আমি যাদের দেখেছি যাদের কথা বললাম তাদের মধ্যে আলী আহমেদ সাহেব, বজলু ভাই, এমদাদুল বারি, চুনকা সাহেব, জহুর আহমেদ চৌধুরী সাহেব, ফনি ভুষণ মজুদার, মিজান চৌধুরী, তাজ উদ্দিন সাহেব এরা সকলেই আমাদের মাঝে আর নেই, বেঁচে আছেন দুই নেতা তোফায়েল ভাই ও সিরাজুল আলম খান। আল্লাহ ওনাদেরকে নেক হায়াত দান করুন।

যাদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় বাগুন্ডি ক্যাম্প থেকে হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিয়েছিল

নতুন প্রজন্ম তোমরা যারা আমার এই লেখা পড়ছো শুধু তাদের কাছে না, আমার যারা মুক্তিযোদ্ধা ভাইয়েরা আছেন তাদের কাছে আমার অনুরোধ, আমার আবেদন আমি আজকে আমার ক্যাম্পের মুক্তিযোদ্ধা যারা এখান থেকে ট্রেনিং নিয়েছে তাদের ব্যাপারে বলবো না, যারা বাকুন্ডি ক্যাম্পের পরিচালনায় ছিলেন তাদের ব্যাপারে কিছুটা বলবো এবং সবার কাছে আমার অনুরোধ সকলকে খুঁজে বের করা যায় কিনা তোমরা সেই চেষ্টা করবে। আমার ক্যাম্পটা উত্তর চব্বিশ পরগণার বসিরহাট থানার বাকুন্ডি নামক জায়গায়। ওখানে একটা প্রাইমারি স্কুল ছিল, পিয়ারী লাল এক ভদ্রলোক ছিলেন, ওনার বাড়িতে উনি স্কুলটা দিয়েছিলেন, স্কুলের চারদিকে প্রায় ১০০ বিঘা জায়গার মতো হবে ওনার খালি ছিল, আর এখানেই আমাদের ক্যাম্পটা স্থাপন করা হয়েছিল। এটা বাংলাদেশের সাতক্ষীরা জেলার পাশ দিয়ে ইছামতি নদী বয়ে গিয়েছে সেখানে দেবহাটা থানার উল্টো দিকেই ইছামতি নদীর পাড়েই ছিল উত্তর চব্বিশ পরগণায়। এটা ৯ নম্বর সেক্টর, ৯ নম্বর সেক্টরে ২ টা প্রশিক্ষণ ক্যাম্প ছিল একটা ছিল সুন্দরবনের ভিতরে হিঙ্গলগঞ্জে, আর একটা ছিল বাকুন্ডি, বাকুন্ডিটা একটা বৃহত আকারের প্রশিক্ষণ ক্যাম্প ছিল। এটার সম্পূর্ণ দায়িত্বে ছিলেন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ৩ নম্বর আসামী লিডিং সীম্যান ক্যাপ্টেন সুলতান উদ্দিন, তৎকালিন উনি ক্যাপ্টেন সুলতান এবং সেক্টরের দায়িত্বে ছিলেন মেজর এম এ জলিল। আর এই ক্যাম্পটা পরিচালনার মধ্যে যারা ছিলেন এর মধ্যে কোষাধ্যক্ষের দায়িত্বে ছিলেন আব্দুল খালেক, সহকারী কোষাধ্যক্ষ ছিলেন উনি খুলনা কমার্স কলেজের তৎকালীন ভিপি শাহ নেওয়াজ চৌধুরী আজাদ, ওনাদের সাথে ছিলেন আমাদের নারায়নগঞ্জের প্রখ্যাত ছাত্রনেতা মনিরুল ইসলাম। ১৯৮১ সালে বিএনপির কর্মি সন্ত্রাসী দ্বারা নিহত মনিরুল ইসলাম সাহেব, আমি মিজানুর রহমান বাচ্চু, স্বাধীনতার পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিলোসফির হেড অফ দ্যা ডিপার্টমেন্ট কাজী নূরুল ইসলাম, নারায়নগঞ্জের আর এক মুক্তিযোদ্ধা অশোক কুমার দাশ এবং মুসলে উদ্দিন, সশস্ত্র বাহিনীর ছিলেন সুবেদার মেজর শামসুল আজম সহ-অধিনায়ক ছিলেন, ছিলেন হাবিলদার মেজর দেলোয়ার হোসেন মিন্টু উনি পুলিশের ছিলেন, আর্মির ইনচার্জ ছিলেন হাবিলদার মেজর হাফিজুর রহমান, সহকারী ইনচার্জ ছিলেন

আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ, ষ্টোর কিপার ছিলেন এম এ গফুর, সহকারী ষ্টোর কিপার ছিলেন মোশারাফ হোসেন, মেডিকেল অফিসার ছিলেন কাজী এমদাদুল হক, হাবিলদার মেজর মোকাম্মেল হোসেন, গোপন সংবাদ দাতা ছিলেন পুলিশের গিয়াস উদ্দিন মিন্টু, ট্রেনিং ইনচার্জ ছিলেন এয়ারফোর্সের লুৎফর রহমান, ইনেসটেক্টর ছিলেন আব্দুর রশিদ, আমজাদ হোসেন, আমান উল্লাহ, একরামুল হক, খলিলুর রহমান এরা সবাই সেনাবাহিনীর ছিলেন, এছাড়া আরও ছিলেন পুলিশের হাবিলদার নূরুল ইসলাম নুরু, ডিসপাস রাইটার কুতুব উদ্দিন, এডমিনিসট্রেটিভ অফিসার মোতাহার হোসেন, আর একজন ইনেসটেক্টর ছিলেন আবু ইউসুফ, পুলিশ হাবিলদার শামসুল হক, মেস কমান্ডার ছিলেন আব্দুল মালেক। এরা সবাই পরিচালিত হতেন ক্যাপ্টেন সুলতানের নির্দেশে। আমি যেসব ভদ্রলোকদের নাম বললাম উনারা তৎকালীন ইপিআর, বাংলাদেশ সেনাবাহিনির বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও পুলিশের কর্মকর্তা ও সিপাহী ছিলেন। যে কয়মাস আমি ক্যাম্পে ছিলাম তাদের সাথে ২৪ ঘন্টা কাজ করাতে খুব একটা ভালো সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। আজও এদের চেহারাগুলি আমার মনে আছে, আমার স্মৃতির মাঝে আজও তারা বিচরণ করছেন। এরা সবাই ৯ নং সেক্টরের অধিনে তৎকালিন পটুয়াখালী জেলা, বর্তমানের বরগুনা জেলা, বরিশাল জেলা, পিরোজপুর জেলা, ফরিদপুর, রাজবাড়ি, গোপালগঞ্জ, বাগেরহাট, খুলনা, এবং যশোরের নড়াইলের দিকের অংশগুলি তার অন্তর্ভুক্ত ছিল। তখনকার বৃহত্তর ফরিদপুর, বৃহত্তর বরিশাল আর খুলনা এগুলো ৯ নং সেক্টরের অধিনে ছিল, আমি আজকে আমার সহযোদ্ধারা যারা আজও জীবিত আছেন, যারা মুক্তিবাহিনীতে ছিলেন বিশেষ করে বরিশাল এবং খুলনা বিভাগের, আপনাদের কাছে আমি অনুরোধ করছি যদি এর মধ্য থেকে কারো সন্ধান আপনারা পান তবে আমাকে দিবেন।

এই চরিত্রের লোকগুলো হয়তো আগামী পাঁচ থেকে দশ বছর পর নাও বেঁচে থাকতে পারে

তোমরা যারা আমার এই স্মৃতিচারণগুলি পড়ছো বিশেষ করে নতুন প্রজন্ম যারা স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রী তোমাদের প্রতি আমার একটা অনুরোধ রইলো, ৭১ এ বাংলার আপামর জনগণ বিশেষ করে যুব সমাজ, বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে নিজেদেরকে যেভাবে বিলিয়ে দিয়েছিল তার ছোট একটা ঘটনা তোমাদের কাছে তুলে ধরছি। এ ঘটনা জানার পর তোমাদের কাছে আমার একটা অনুরোধ, আশা করি তোমরা সেটা রাখবে। তোমরা অনেকেই আগে জেনেছো মোংলা পোর্ট এর কাছে ৭১ এ আমার ক্যাম্প ছিলো, জায়গাটার নাম বাজুয়া বাজার। সেখানে নজির মিয়া নামে এক ভদ্রলোকের বিরাট একটা বাড়ি ছিল। মার্চ মাসে যখন ঐ এলাকায় পাক আর্মি ঢুকেছিলো তখন প্রথন দিনই তারা সেই নজির মিয়াকে হত্যা করে। নজির মিয়ার বিরুদ্ধে স্থানীয় মাদ্রাসার তৎকালীন ধর্ম ব্যবসায়ীরা অভিযোগ দিয়েছিল যে তিনি আওয়ামীলীগের তৎকালীন উচু মানের নেতা। তার পরিত্যাক্ত বাড়ীতেই আমরা ক্যাম্প করেছিলাম। আমার সাথে ৯০ জন বেঙ্গল রেজিমেন্টের, ইপিআর, পুলিশ ও আনসার সদস্য ছিল এবং ৪২ জন ছিল সাধারণ ছাত্র জনতা, যারা ভারতীয় ট্রেনিং নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ করতে এসেছিল। বাজুয়াতে আমাদের সাথে একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন, তিনি ছিলেন অনেক উচু মনের মানুষ এবং তিনি বঙ্গবন্ধুর আত্মীয় ছিলেন। আমরা তাকে ফরিদ নানা বলে ডাকতাম। যেদিনের ঘটনা বলছি সেদিন ছিল ৬ অথবা ৭ ডিসেম্বর। ভারত বাংলাদেশকে ৬ ডিসেম্বর স্বীকৃতি দিয়েছিল , এর আগেই আমরা এই অঞ্চলকে মুক্ত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করেছিলাম। কারো সাথে যুদ্ধ নেই, আমরা লোকাল এডমিনিষ্ট্রেশন রক্ষার জন্য কাজ করে যাচ্ছি এমন সময় ফরিদ নানা ক্যাম্পে আসলেন, তখন ফরিদ নানার বয়স ছিলো ৪৯ বা ৫০ বছর, তিনি এই বয়সেও মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং নিয়েছিলেন এবং আমার গ্রুপেই উনি এসেছিলেন। তিনি বঙ্গবন্ধুর খুব ঘনিষ্ট আত্মীয় হওয়ার সুবাদে সেক্টর কমান্ডার ওনার কথা রাখতেন এবং ফরিদ নানার অনুরোধেই আমাকে ঐ গ্রুপের প্রধান করা হয় এবং ফরিদ নানাই আমাদেরকে রাস্তা চিনিয়ে সুন্দরবনের ভিতর দিয়ে বাজুয়া বাজার ক্যাম্পে নিয়ে এসেছিলেন। ওখানে আসার পর আমাদের সাথে রাজাকারদের অনেক সম্মুখ যুদ্ধ হয়েছিল। এলাকা মুক্ত করার পর আমরা

লোকাল এডমিনিষ্ট্রেশনটা চালিয়ে যাচ্ছি, তা না হলে ডাকাতি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। আমরা চলে গেলে লুকিয়ে থাকা রাজাকাররা ডাকাতি ও লুটপাট করতো, এজন্য সেক্টর কমান্ডারের আদেশ না আসা পর্যন্ত আমরা অপেক্ষায় ছিলাম। ফরিদ নানা একদিন এসে বললেন, নানা আমি তোমাদের সাথে একটু কথা বলবো। আমি বললাম বলেন নানা। ফরিদ নানা বললেন, নানা এই এলাকাটা খৃষ্টান ও হিন্দু এলাকা মুসলমানদের বাড়ীঘর এখানে খুবই কম। এখানকার লোকজন এখন এখানে নেই কিন্তু নানা খুবই কষ্ট লাগে, ফসলের ক্ষেতগুলোর দিকে তাকালে, জমির ধানগুলি পেঁকে রয়েছে, পাঁকা ধানের ভারে ধানগাছ মাটিতে নুয়ে পড়েছে। হাজার হাজার বিঘা জমির ধান নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। নানা তুমি যদি একটা ব্যবস্থা করতে, তোমার সাথে যে মুক্তিযোদ্ধারা আছে তাদের দিয়ে যদি ধানগুলি একটু কাটিয়ে দাও তাহলে এখানকার যারা ভারতের শরণার্থী শিবিরে আছে তারা যখন ফিরে আসবে তখন তাদের খাদ্যের অভাব হবে না। নানা তুমি এই কাজটা একটু করো। আমি নানাকে বললাম, আপনি একটু বসেন আমি দেখছি। আমি আমার টুআইসি যার নাম ছিল রফিকুল ইসলাম উনি পুলিশের হাবিলদার মেজর ছিলেন, আমি রফিক সাহেব কে বললাম ঘটনাটা, এটা মানবতার ব্যাপার আমাদের ছেলেরা তো বসে আছে, ওরা যদি ধানগুলো কেটে দিত। রফিক সাহেব বললেন স্যার আপনি একটা কাজ করেন, আমাদের দলে যত মুক্তিযোদ্ধা আছে সকলে আপনাকে সম্মান করে, শ্রদ্ধা করে ও আপনার কথা মনেপ্রাণে শোনে এবং আপনাকে তারা আন্তরিকভাবে ভালোবাসে, আমি সকলকে আপনার সামনে ডেকে আনি আপনি ওদেরকে একটু ব্রিফ করলে আশা করি ওরা এটা করবে। উনি ক্যাম্পের সামনের মাঠে সকলকে দাঁড় করালেন, আমি তখন সকলের উদ্যেশ্যে বললাম এই দেশকে রক্ষা করা হলো আমাদের সকলের কাজ, দেশের মানুষের জীবন বাচাতে, মা-বোনদের ইজ্জত রক্ষার্থে, বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য আমরা যুদ্ধ করেছি আমাদের জীবনকে আমরা বিলিয়ে দিয়েছি, কোথায় আমাদের বাড়িঘর, কোথায় আমাদের বাবা-মা কে কোথায় কিভাবে আছে, এখান থেকে আমরা কিভাবে বাড়ী যাব সেটাও আমরা জানি না। তবে যুদ্ধ এখন থেমে গিয়েছে কানাঘুষা চলছে কয়েক দিনের মধ্যে পাক আর্মি হয়তো স্যারেন্ডার করবে। তখনতো শরনণার্থী শিবিরে যারা আছে তারা দেশের মাটির জন্য পাগল হয়ে দেশে চলে আসবে, তখন এরা খাবে কি? ফরিদ নানাকে তোমরা সবাই চিন অনেকদিন যাবত আমাদের সাথে আছেন,

উনি একটা প্রস্তাব নিয়ে আমার কাছে এসেছেন। এখন অগ্রহায়ন মাসের মাঝামাঝি এখানের ক্ষেতে হাজার হাজার মণ ধান পেকে নষ্ট হবার উপক্রম হয়েছে, আমরা যদি এই ধান কেটে মজুদ করে দেই তাহলে শরণার্থী শিবিরের লোকেরা এসে পাবে এবং তখন তাদের খাবার চাহিদা মিটবে। কারণ আমাদের সরকার গঠন হলে কতদিন পর এদের কাছে রিলিফ আসবে তা জানা নেই ততদিন এরা না খেয়েই অনেকে মারা যেতে পারে। ফরিদ নানার সাথে এক ভদ্রলোক এসেছিলেন তিনি ওই এলাকার চেয়ারম্যান ছিলেন, ফরিদ নানা উঠে বললেন তোমরা পরিশ্রমটা করো আমরা যতটুকু পারি তোমাদেরকে পারিশ্রমিক দেব, আমার কাছে কিছু টাকা আছে এবং এই চেয়ারম্যান সাহেবের কাছেও কিছু টাকা আছে তা দিয়ে আমরা তোমাদেরকে যতটা পারি পারিশ্রমিক দেব। আমি তখন বললাম তোমাদের মতামত আমাকে জানাও, তোমাদের মতামতের উপর আমার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তখন আমার দলের মুক্তিযোদ্ধারা বলল স্যার আমাদেরকে ১০ মিনিট সময় দেন। আমি তাদের সময় দিলাম, আমার ওখানে বারোটা গ্রুপ ছিল প্রতি গ্রুপে ১০ থেকে ১২ জন করে মুক্তিযোদ্ধা ও একজন গ্রুপ কমান্ডার ছিল। তখন সকল গ্রুপের কমান্ডাররা বসে আলাপ-আলোচনা করে আমার কাছে আসলো এবং এসে বলল আমরা একজন একটু কথা বলব স্যার, আমি বললাম বল, একজন বলল স্যার আপনি আমাদেরকে যে প্রস্তাব দিয়েছেন এটা আমাদের করা কর্তব্য এবং এটা আমাদের ডিউটির মধ্যে পড়ে, তাই এটা আমরা করবো। আমরা সবাই একমত, তবে স্যার আমাদের একটা শর্ত আছে আপনার কাছে। আমি চিন্তা করলাম ওরা আবার কি শর্ত বলে, কি দাবি করে তারা, আমি বললাম ঠিক আছে বল তোমাদের শর্ত, ওরা বলল স্যার আমরা যুদ্ধের মধ্যে জীবন দিতে এসেছি আসার সময় আমাদের যারা আত্মীয়-স্বজন আছে তাদেরকে বলে এসেছি যে তোমরা দোয়া করো আমরা যেন দেশের স্বাধীনতা আনতে পারি, আমরা যেন দেশের জন্য যুদ্ধ করে প্রাণ দিতে পারি, তো স্যার আমরা তো টাকার লোভে যুদ্ধ করতে আসি নাই, যত সময় লাগে যত ধান আছে আমরা কেটে দেব, আমরা ধান মাথায় করে যেখানে রাখতে বলেন সেখানে পৌঁছে দেব কিন্তু স্যার একটা কথা, পারিশ্রমিকের কথা আপনারা বলবেন না। এ ধান কে খাবে? যাদেরকে বাঁচাবার জন্য যুদ্ধ করতে এসেছি যাদের জন্য জীবন দিতে এসেছি তারাই তো খাবে, তাদের অন্নসংস্থান করার জন্যই আমরা এটা করবো, আমাদের মাফ করবেন স্যার আমরা কোন

পারিশ্রমিক নিবো না। আর একটা কথা স্যার আমরা ক্যাম্পে খাচ্ছি, আল্লাহ যেভাবে হোক আমাদের খাবার খাওয়াচ্ছেন এখানে নানারা যেন কোন খাবারের ব্যবস্থা আমাদের জন্য না করে। আমি চুপ করে বসে রইলাম আমার চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়তে লাগলো। আজকের প্রজন্ম যারা আছো তোমরা চিন্তা করতে পারো কি?

বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে তারা কতটুকু পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল, এই বাংলার যুবসমাজ নিজেদেরকে পরিবর্তন করে ফেলেছিল দেশের জন্য জীবন দিতেও লাইন ধরে ছিল কার আগে কে জীবন দিবে তার প্রতিযোগিতায় নেমেছিল। আমি তখন আর কোন কথা বলতে পারলাম না আমার চোখ দিয়ে পানি পড়তে লাগল, এরপর তারা বলল, স্যার আমাদের হুকুম করেন কখন যেতে হবে। আমি বললাম ঠিক আছে আমি তোমাদেরকে বলছি। এরপর আমি নানাকে বললাম ধান কাটার জন্য কাঁচি লাগবে, বোঝা বহন করতে হলে দড়ি লাগবে, কাঁচি ও দড়ির ব্যবস্থা করে দেন। নানা বললেন কাঁচির ব্যবস্থা কিছু করা আছে, বাকি ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি যথা সময় সব ব্যবস্থা হয়ে গেল। জায়গাটা লাউড়ুগ ইউনিয়নের মধ্যে ছিল সেখানে আমরা গেলাম, সত্যি আশ্চর্য লাগল হাজার হাজার মণ ধান ক্ষেতে পড়ে আছে, গ্রামে কোন লোক নাই, কোন জন নাই, পাখি পক্ষী এসে এগুলো খাচ্ছে। যাহোক ৪ থেকে ৫ দিনেই একশত ত্রিশ বত্রিশ জন মুক্তিযোদ্ধা মিলে সব জমির ধান কেটে ফেললাম। আমিও কাঁচি দিয়ে ধান কেটেছি খুব একটা কঠিন কাজ না। গাছের গোড়াটা ধরে কাঁচি দিয়ে কেটে ফেলেছি, যেখানে কেটেছে সেখানেই রেখেছি, যে যত ধান কেটেছে, তার বোঝা সে নিজেই বেঁধেছে, শুধু বোঝা মাথায় উঠাতে একজন আরেকজনকে সহযোগিতা করেছি। চার থেকে পাঁচ দিনে আমরা প্রায় তিন/চার হাজার মণ ধান কেটে এনে মজুদ করলাম, পরে সেই চেয়ারম্যান ও ফরিদ নানা বললেন, যাক এখন পানি চলে আসলেও আমাদের আর ভয় নেই, ধান পচার আর কোনো সম্ভাবনা নেই। তারা কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমাদের হাতে ও মাথায় হাত বুলিয়ে চলে গেলেন, আমরাও আত্মতৃপ্তিতে খুব খুশি মনে ক্যাম্পে ফেরত আসলাম কারণ এত লোকের খাবার ব্যবস্থা আমরা করে দিয়ে আসতে পেরেছি।

তোমাদের কাছে আগেই বলেছি তোমাদের জন্য আমার একটা উপদেশ ও অনুরোধ আছে। উপদেশটা হচ্ছে এই যে যুদ্ধের শেষ হয়েছে, বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে ৫০ বছর। আর এই ৫০ বছরে অর্ধেকের বেশি মুক্তিযোদ্ধা পৃথিবী ছেড়ে চলে গিয়েছে।

তোমাদের কাছে অনুরোধ আশেপাশে তোমরা যদি কোন মুক্তিযোদ্ধা পাও তবে তাদেরকে সর্বোচ্চ সম্মান দেওয়ার চেষ্টা করবে এবং তাদের থেকে দোয়া নেয়ার চেষ্টা করবে। এই চরিত্রের মানুষ বাংলাদেশে আর কখনো জন্মগ্রহণ করবে না এটা আমি চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলতে পারি। কারণ এই জন্য যে, আমরা যে দলের নেতার অনুপ্রেরণায় জীবনবাজি রেখে জীবন দিতে গিয়েছিলাম দেশের স্বাধীনতার জন্য এবং আমরা ছিনিয়ে এনেছি স্বাধীনতা, কিন্তু সেই দলের নেতারা এখন আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের কোন মূল্যায়ন করে না। শুধুমাত্র মূল্যায়ন পাচ্ছি বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার কাছ থেকে এবং উনার জন্য আমরা কিছুটা সম্মান নিয়ে বেঁচে আছি। একুশটা বছর সেই পাক প্রেতাত্মারা এ দেশটাকে শাসন করেছে, এ সময় আমরা যে মুক্তিযোদ্ধা তা মুখে আনতে পারতাম না, বলতেও পারতাম না, বহু মুক্তিযোদ্ধাকে তারা মেরে ফেলেছে, বহু মুক্তিযোদ্ধা সৈনিককে তারা ফাঁসি দিয়েছে এবং সেন্ট্রাল জেলে মেরেছে। আমি দোয়া করি তার জন্য, যতদিন দেশের শাসনভার উনার হাতে থাকবে, ততদিন আমরা সকলে সুখ-শান্তিতে জীবন কাটাতে পারবো এটা আমি নিশ্চিত। তাই তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ রইলো, মুক্তিযোদ্ধাদের তোমরা যেখানে পাও তাদেরকে সম্মান করো, ভবিষ্যতে তোমরা যেন বলতে পার আমি একজন মুক্তিযোদ্ধার সন্ধান পেয়েছিলাম, উনি আমাকে মাথায় হাত দিয়ে দোয়া করেছিলেন। আর মুক্তিযোদ্ধা যারা আছে তাদের চরিত্রটাকে যদি তোমরা অনুসরণ করতে পারো এবং বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে ধারণ করে যদি তোমরা লালন করতে পারো তবে এই দেশ অবশ্যই উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে যাবে।

- সব কথা ভুলে যেতে নেই, সময় বুঝে ফেরত দেওয়ার জন্য হলেও কিছু কথা মনে রাখতে হয়।

কী ঘটেছিল সেদিন? ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১

অনেক তো পাঠ্যবইয়ে, গল্পের বইয়ে পড়েছো ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে কি হয়েছিল। আজ না হয় একজন মুক্তিযোদ্ধার মুখেই শুনে নাও কেমন ছিল সে অনুভূতি যখন জানতে পারলাম আমার সোনার দেশটি আজ থেকে আর অন্যের অধীনে নেই, আমার দেশটি এখন পরিচিতি পাবে এক স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশ আমার গর্ব।

আজকে আমি স্মৃতিচারণ করবো ১৯৭১ এর ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবসের দিন আমার অনুভূতি কি ছিল? কিভাবে আমরা কাটিয়েছি তার কিছুটা তুলে ধরবো।

আমরা ৬ তারিখেই আমাদের এলাকা মোংলাপোর্ট এর আসেপাশে শত্রু মুক্ত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করেছিলাম, এর পর থেকে আমরা বাইরে থেকে কেউ এসে যাতে এলাকার কোনো ক্ষতি করতে না পারে সেদিকে খেয়াল করে লোকাল এডমিনিষ্ট্রেশনটা কড়াকড়িভাবে ঠিক রাখতে ছিলাম। আমি ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১ তারিখ থেকে একটা খবর পাচ্ছি, যে সুন্দরবনে কিছু রাজাকার পালিয়ে আছে তারা আমাদের ক্যাম্পের উপর একটা মরণ কামড় দেবে। আমি চিন্তা করলাম এই সুযোগটা তাদেরকে আমি দেব না, আমি ১৫ তারিখে সন্ধ্যার পর আমার টুআইসি রফিক সাহেবকে নিয়ে বসলাম বসে আলাপ আলোচনা করলাম, যে গোয়েন্দা রিপোর্ট আছে রাজাকাররা সুন্দরবনে একত্রিত হচ্ছে তারা আমাদের ক্যাম্প আক্রমণ করবে এবং একটা মরণ পণ যুদ্ধ আমাদের বিরুদ্ধে করবে। আর এটা ওরা করলে আমাদের অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে। এই স্বাধীনতার ঊষালগ্নে এসে যদি আমাদের কোন মুক্তিযোদ্ধাকে আমরা হারিয়ে ফেলি তাহলে তা হবে আমার জন্য সবচাইতে দুঃখজনক একটা ব্যাপার। আমরা আলোচনা করলাম ওরা আমাদেরকে আক্রমণ করার আগেই আমরা ওদেরকে আক্রমণ করবো। রফিক সাহেব বললেন, স্যার আপনি ক্যাম্পে থাকেন আমরা যাই, আমি বললাম, না এটা ঠিক হবে না। এটার নেতৃত্ব আমিই দিব, আমাকেই যেতে হবে, তবে যারা নাকি এখানে শিক্ষিত, কলেজ পড়ুয়া ছেলেরা আছে তাদেরকে আমি সাথে নিব না, কারণ তাদের পরিবার আছে পরিবারের প্রতি তাদের দায়িত্ব অনেক, এখন তারা মানুষ হয়ে সংসার চালাবে আমি এই চিন্তা করে তাদেরকে বাদ দিয়ে আমি পুলিশ, আনসার, বেঙ্গল রেজিমেন্ট এবং মুক্তিযোদ্ধাদের ভিতরে বয়স বেশি দেখে লোক নিলাম। এর মধ্যে ছয় জন

এলএমজি ম্যান নিলাম, আমরা ১৬ তারিখ সকাল বেলা একটা নৌকায় করে সুন্দরবনের একটা শাখা নদী দিয়ে সুন্দরবনে নামলাম। যেহেতু সুন্দরবনের রাস্ত াঘাট আমরা কিছুই চিনি না, তাই ফরিদ নানাকে বললাম নানা সুন্দরবনের রাস্তাঘাট আমরা কিছু চিনি না তাই রাস্তা চিনানোর জন্য কাউকে পাওয়া যাবে কিনা। নানা বললেন আমার এক শিকারী পরিচিত আছে নাম গোপাল শিকারী, নানা তাকে খবর দিতেই অল্প সময়ের মধ্যে সে হাজির হল আমাদের কথা শুনে, সে বললো অনেক চেষ্টা করেও পরিবারের কারণে আমি মুক্তিযুদ্ধে যেতে পারিনি তাই এই কাজটায় আমি যাব আপনাদের সাথে। দাদা আমি জীবনে অনেক বাঘ, হরিন শিকার করেছি আমার ট্রেনিংএর দরকার হবে না, আপনাদের সাথে আমি যাব। আমি বললাম আপনি রাইফেল চালাতে পারেন? তিনি বললেন না দাদা রাইফেলের দরকার হবে না আমার কাছে বন্দুক আছে, আমি বললাম বন্দুক দিয়ে তো কাজ হবে না, সে বললো না দাদা হবে, আমার কাছে বন্দুকে বুলেট ও বিভিন্ন ধরনের কার্টিজ আছে, আমি বললাম কতগুলো কার্টিজ আছে আপনার কাছে, সে বললো দাদা আমি তো বিভিন্ন লোকের সাথে শিকারে যাই, তো শিকার শেষে তারা অবশিষ্ট কার্টিজ গুলো আমাকে দিয়ে যায় তা প্রায় আড়াশো কার্টিজ আমার কাছে আছে। আমি বললাম, ঠিক আছে এমনকি সারাদিনও ওদের সাথে আমাদের যুদ্ধ হতে পারে তাই আপনি আপনার মতো করে সরঞ্জাম নিয়ে নেন। আমরা কখন রওয়ানা দেব জিজ্ঞাসা করলে সে বললো দাদা সুন্দরবনের রাস্তা তো অনেক কঠিন রাস্তা তার ভিতর দিয়ে হাটতে পারবেন না, আমি বললাম আমরা পারবো, সে বললো না দাদা আপনি তো দেখেন নি, যদি দেখেন তখন বলতে পারবেন, এমনি স্বাভাবিক রাস্তায় আমরা ঘন্টায় চার পাচঁ মাইল হাটতে পারি কিন্তু ওখানে ঘন্টায় আধা মাইল ও হাঁটতে পারবেন না। আমি বললাম ব্যাপারটা কি? দাদা ওটা খুব সংকটপূর্ণ রাস্তা আপনি গেলে বাস্তবতা বুঝবেন। আমার কৌতুহল জাগলো এমন কি রাস্তা যে এক ঘন্টাতে আধামাইল হাটবো। ফজরের নামাজের পরেই আমরা রওয়ানা হলাম আমার সাথে ৪৫/৪৬ জন নিয়ে রওয়ানা হলাম। ইউসুফ বাধ সাধলো, তাকে নিতেই হবে, আমি বললাম না, তখন সে বললো তাহলে ক্যাম্পে ফিরে এসে আমার লাশটা দেখবেন। আমি স্যার আপনাকে একা ছাড়তে চাই না আমি আপনার সাথে যাব। আমি বললাম তুমি বাচ্চা ছেলে, সে বললো আমাকে একবার মৃত্যুর হাত থেকে আপনি নিয়ে এসেছেন আমি স্যার আপনাকে ছেড়ে কোথাও থাকবো না। আমাকে আর্মস

দেন আর না দেন আমি আপনার সাথে যাব, আমি বললাম ঠিক আছে তোমার আর্মসই তুমি নিবা। আমরা চললাম আট থেকে সাড়ে আটটার দিকে আমরা বনের ভিতরে গিয়ে নামলাম। নামার সাথে সাথে দেখি গাছে সাপ ঝুলে আছে, আরে বিচিত্র ব্যাপার সাপ কেন? গোপাল শিকারী বললো এটা সুন্দরবনের ন্যাচার, প্রত্যেকটা গাছে আপনি সাপ দেখবেন তবে ওরা পড়বে না আপনাকে দেখলে ওরা গুটিয়ে উপরে উঠে যাবে। আপনি আমার সাথে আসেন, আমরা বনের ভিতরে উঠলাম, বনের ভিতরে ওঠার পরে যা দেখলাম তা আমার জীবনে দেখিনি তোমরা যারা গ্রামে আছো তারা বুঝবা সুন্দরবনের ভিতরে গরুর খুটার মতো ছয় ইঞ্চি পর পর এরকম খুটা, এটার ভিতর দিয়ে কিভাবে হাঁটবো! তো ফাঁকে ফাঁকে পা ফেলা লাগে, গোপাল নিজে হাঁটে বলে আধা মাইল বলছে এখন আমার মনে হচ্ছে, না ঘন্টায় আমরা কোয়ার্টার মাইল যেতে পারবো। যাহোক আমাদের যেখানে যাওয়ার কথা ছিল আমাদের ইনফর্মাররা গোপাল শিকরীকে ইনফর্ম করে দিয়েছে, রাজাকাররা সুন্দরবনকে সামনে রেখে এবং বঙ্গোবসাগরকে পিছনের দিকে রেখে ক্যাম্প করেছে অর্থাৎ তাদের যদি এটাক করা হয় তাহলে বঙ্গোবসাগরের দিকে পালিয়ে যাবে। আমরা দেড়টা দুটার দিকে ওদের কাছাকাছি পৌঁছালাম ওদের ছাউনিগুলি দেখা যাচ্ছিল। আমরা ওদের ক্যাম্পটাকে ঘেরাও করে চারিদিকে পজিশন নিলাম, আমার সাথে রফিক সাহেব বললেন ওদের তো কেউকে দেখা যাচ্ছে না তো আমি একটা ফায়ার করে দেখি যে ওরা কি উত্তর দেয়। রফিক একটা ফায়ার করলো কোন উত্তর নাই, কতক্ষণ পর দেখি একটা ফায়ার ওখান থেকে হলো, আমরা বুঝলাম তারা ওখানে আছে এরপর আমাদের এলএমজি, রাইফেল গুলি গর্জে উঠলো, তারা দুই চারটে গ্রেনেড চার্জ করলো তারপর তারা নিস্তব্দ, আমি আমাদের দলটাকে আর গুলি ছুড়তে নিষেধ করে বললাম তাদের পজিশনটা দেখে নেই, সবাই এ্যাডভান্স হও। ওরা আমাদের থেকে ৫০০ মিটারের মত দূরে ছিল আমরা এ্যাডভান্স হয়ে ২০০ মিটারের মত কাছাকাছি গেলাম এমন সময় দেখি পিছন থেকে গোলাগুলির শব্দ হচ্ছে। অবিরাম গোলাগুলি, আমরা হতভম্ভ হয়ে গেলাম। ওরা কি পিছন থেকে এটাক করেছে? তখন আমি রাজাকারদের দিকে দুইটা এলএমজি তাক রেখে বাকিগুলো অপজিট দিকে তাক করে দেখতে লাগলাম শব্দের উৎসটা কোথায়? আমরা উঠে আস্তে আস্তে সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছি যত যাচ্ছি তত গুলির শব্দ বিভিন্ন গুলির শব্দ। গ্রেনেড চার্জ হচ্ছে, গোলাগুলি হচ্ছে, হ্যাঁ

আমরা অগ্রসর হয়ে যখন নদীর পাড়ের দিকে এলাম তখন দেখি আমাদের ক্যাম্পের দিকে আওয়াজটা হচ্ছে। অজশ্র গোলাগুলি হচ্ছে গ্রেনেড চার্জ হচ্ছে। ভাবলাম ব্যাপারটা কি? আমার হঠাৎ মনে পড়লো আমার সাথে তো ওয়াকিটকি আছে। আমি আমাদের ক্যাম্পে যাকে ওয়াকিটকির দায়িত্বে রেখেছিলাম সেই রবের সাথে কন্ট্রাক্ট করার চেষ্টা করছি কিন্তু সে রিসিভ করে না। আরো ঘাবড়ে গেলাম। এখন কি পজিশন যতোই সামনে আসি ততোই আওয়াজটা প্রকট হচ্ছে, আমি বললাম ওরা তো ক্যাম্প আক্রমণ করেছে, তাড়াতাড়ি আমরা মাঝিদের সাথে যার হাতে যা আছে তা দিয়ে বেয়ে আসতে শুরু করলাম। সাত আট মিনিট পর দেখলাম ওয়াকিটকি রেড সিগন্যাল দিচ্ছে রব ব্যাক করেছে। রব আমাকে বললো, আপনি কোথায়? আমি বলালাম আমরা রাজাকারদের এ্যাটাক করেছিলাম কিন্তু পিছনে অনেক গোলাগুলির শব্দ শুনে ক্যাম্পের দিকে আসতেছি এটা কিসের গোলাগুলি? তোমাদের কি কেউ এ্যাটাক করেছে? ও বলে না, আপনে তাড়াতাড়ি আসেন। আমি বললাম কেন কি ব্যাপারটা কি? ও বললো পাকিস্তনী আর্মি স্যারেন্ডার করেছে আমরা সেই ফুর্তিতে গোলাগুলি করছি আর গ্রেনেড ফুটাচ্ছি। হায়রে আল্লাহ খুশিতে আমি যে তাদেরকে কিছু বলবো সে ভাষা হারিয়ে ফেলেছি। আমার সাথে আমার কাছাকাছি যারা বসেছিল তারা ওয়ারলেছের কথা শুনেছে এবার তারাও আনন্দে হৈচৈ করে উঠেছে। মাঝিরা বললো স্যার ব্যাপার কি? আমি বললাম ঢাকা স্বাধীন হয়ে গেছে আমরা এখন স্বাধীন দেশের নাগরিক। এবার আমার সাথে যারা ছিল তারা যার যার অস্ত্র আকাশের দিকে উঁচিয়ে ইচ্ছে মত গোলাগুলি শুরু করে দিল, তারা ফুর্তি করা শুরু করলো আমি নিষেধ করলাম না। যাক গুলিতো আমাদের আর দরকার নাই তাই করুক না একটু ফুর্তি। যাহোক তখকার যে আমার অনুভুতি তা তোমাদেরকে আমি বোঝাতে পারবো না। এটা আমার জীবনের একটা স্মৃতি, যদি তোমাদেরকে সেই জায়গায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারতাম তাহলে তোমদেরকে বোঝাতে পারতাম যে নয় মাসের যুদ্ধের পর আমরা যে একটা দেশ পেয়েছি আমাদের নেতৃত্ব দিবেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু, আমরা এই আশা বুকে নিয়ে যুদ্ধ করতে গিয়েছি এবং আমাদের সে আশা পূর্ণ হয়ে গেছে আমাদের আর চাওয়া পাওয়ার কিছু নেই। আমরা ঠিক সন্ধ্যা নাগাদ ক্যাম্পে ফিরে এলাম। তখন বিভিন্ন ভাবে জয় বাংলার শ্লোগান দিচ্ছে, আমার নেতা তোমার নেতা শেখ মুজিব শেখ মুজিব, তোমার আমার ঠিকানা পদ্মা মেঘনা যমুনা, মুখোরিত আমার ক্যাম্প। এটা

দেখে আশে পাশের যতো লোক ছিলো মহিলা বাচ্চা সকলে ভিড় করেছে। আমি অভিভুত হয়ে পড়লাম আমার জীবনের এটা একটা স্বরণীয় ঘটনা। সারারাত ধরে চললো আনন্দ, মহিলারা তেলের পিঠা পাটিসপ্টা পিঠা, মুরগির মাংস, ভাপা পিঠা কত কি নিয়ে হাজির হচ্ছে। আমরা লোক হচ্ছি ১৩২ জন কিন্তু শত শত লোকের খাবার আসতে লাগলো সকালে। মহিলারা নিয়ে এসে বলছে স্যার আপনি একটু খাবেন। আপনি যদি না খান আমি খুব দুঃখ পাব। সারারাত, সকাল, সারাদিন শুধু খাবার আর হৈচৈ। আমার মনে হয় গ্রামে যত গাছে ফুল ছিল তা আর গাছে ছিল না। সব মুক্তিযোদ্ধাদের তারা ফুলের মালা দিয়েছে। এমন কেউ ছিল না যে আট থেকে দশটা মালা না পেয়েছে। ওই ইউনিয়নের যত লোক ছিল সকলে এসে ভিড় করেছে আমাদের ক্যাম্পে। আজকে আমার বয়স ৭৫ এর বেশি কিন্তু যখনই এসব স্মৃতি মনে পড়ে আমি আপ্লুত হয়ে পড়ি।

- পৃথিবীর সব থেকে ভয়ঙ্কর প্রাণী হচ্ছে মানুষ, নিজেদের প্রয়োজনে সব কিছু করতে পারে।
- এমন বন্ধুত্ব না করাই ভালো, যা সময়ের সাথে সাথে হারিয়ে যায়।
- পৃথিবীতে সব থেকে নিকৃষ্ট সে, যে গরিবের হক মারে।

আজও জানতে পারলাম না কেন সেই ১ মাস আমাদের কারাগারে বন্দি করে রেখেছিলো

যুদ্ধ বিজয়ের পর বাড়ি যাওয়ার পালা, আমি আগে বলেছি ১৬ ডিসেম্বর সারাদিন একটা উৎসবের দিন ছিল, ১৭ তারিখ সারাদিন শেষে রাত আটটা সাড়ে আটটার দিকে খুলনা থেকে আমাকে মেসেজ করা হলো, ক্যাম্পের যিনি ইনচার্জ ছিলেন ক্যাপ্টেন সুলতান উদ্দিন সাহেব আমাকে বললেন বাচ্চু তোমার সাথে ঢাকার যে কয়জন আছে তাদেরকে নিয়ে তুমি সকালেই রওয়ানা দাও, খুলনাতে চলে আসো। আমি ওনাকে বললাম, ক্যাম্পের চার্জ কাকে দিব, উনি বললেন আপাতত তুমি টুআইসিকে দিয়ে এসো পরে আমরা ব্যাবস্থা নিব। টুআইসি রফিক সাহেবকে ডেকে বললাম, আমাকে তো চলে যেতে হচ্ছে, সকালে আমি চলে যাব, আমার যারা মুক্তিযোদ্ধা ভাইয়েরা আছে সবাইকে একটু খবর দেন। সবাইকে খবর দেয়া হলো, সকলে সামনে আসলো, আমি সবাইকে বললাম অনেক দিন তোমাদের সাথে ছিলাম তোমাদের সাথে একটা আত্মীয়তার মতো সম্পর্ক হয়ে গিয়েছে, আমি তোমাদেরকে আমার মায়ের পেটের আপন ভাইয়ের মত দেখেছি তার মাঝেও অবস্থার প্রেক্ষিতে কারো সাথে খারাপ ব্যবহার করে থাকতে পারি, আজকে আমরা যুদ্ধে জয়ী হয়েছি আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি একটা বিরাট জয় নিয়ে আমারা যার যার বাড়িতে ফিরে যাব, আমরা এক এক জন এক এক জায়গা থেকে এসে একমনা হয়ে, এক পরিবার হয়ে লড়েছি, একে অপরের দুঃখ ভাগ করে নিয়েছি এরপরও যদি কেউ আমার ব্যবহারে কষ্ট পেয়ে থাকো তবে আমাকে বড় ভাই হিসেবে ক্ষমা কর দিও। আমি খেয়াল করলাম যে মুক্তিযোদ্ধা যারা আমার সামনে ছিল তাদের অনেকের চোখ পানিতে ছল ছল করছে। আমি তাদেরকে বললাম বেচেঁ যদি থাকি আমি তোমাদের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করবো তোমরাও যদি পার কোন ব্যাপারে প্রয়োজন হলে যোগাযোগ করো। ১৭ তারিখ সকালে আমি বাজুয়া ক্যাম্প থেকে খুলনার উদ্যেশ্যে রওয়ানা হলাম। রাতে নৌকা একটা ঠিক করা ছিল, ফজরের আযানের পর পর আমরা রওয়ানা হলাম, আমার সাথে আমার নারায়নগঞ্জের ছাত্রনেতা মনিরুল ইসলামের ছোট ভাই যে এখন আমেরিকা প্রবাসী প্রকৌশলী আব্দুর রব খোকা তাকে নিলাম ক্যাপ্টেন সুলতান উদ্দিন সাহেবের ছোট ভাই সালাউদ্দিন

আহমেদ চুন্নু তাকে নিলাম, খুলনার শাহনেওয়াজ জামান আজাদ আমি আগে ওনার পরিচয়টা দিয়েছি উনি কমার্স কলেজের ভিপি ছিলেন, তার ছোট ভাই শাহ আলম চৌধুরী মিরাজকে সাথে নিলাম, ইউসুফ আমাকে বললো স্যার আপনাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না, আমি বললাম ঠিক আছে তুমি চলো আমার সাথে। আমরা বাজুয়া ক্যাম্প সকালে ত্যাগ করলাম, আমি অবাক হলাম আমার সাথের মুক্তিযোদ্ধা ভাইয়েরা রাতে কেউ ঘুমায়নাই, আমি কখন যাব, আমাকে নৌকায় উঠিয়ে দিবে আজও সেই স্মৃতিটা মনে পড়ে আমার চোখে পানি এস পড়ে, আমি দেখেছি তারা অনেকে বাচ্চাদের মতো হু হু করে কেদেঁছে আমাকে পায়ে ধরে সালাম করেছে দোয়া নিয়েছে আমি তাদেরকে বুকে জড়িয়ে ধরেছি। যাহোক বিদায়ের পালা শেষ হলো, আমরা রওয়ানা দিলাম, ঠিক দুপুর নাগাদ খুলনায় এসে আমরা পৌঁছলাম, ১৮ তারিখ বাংলাদেশের প্রত্যেক জায়গায় প্রত্যেকটা জেলা প্রায় মুক্ত হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু রাজাকাররা খুলনা শহরটাকে আকড়ে ছিল, ১৬ এবং ১৭ তারিখ মুক্তিবাহিনীরা শহরে ঢুকতে পারেনি, তবে ১৯ তারিখে একটা প্লান হয় যে তাদেরকে চারদিক থেকে আক্রমণ করা হবে, সাথে মিত্রবাহিনীও থাকবে, এ কথা তারা জানতে পেরে ১৭ তারিখ সন্ধ্যার পর থেকে রুপসা পেরিয়ে তারা পালিয়ে গিয়েছিল। ১৮ তারিখ আমি নেমে দেখি পুরো শহরে মিছিল হচ্ছে মানুষ একজন আর একজনকে কোলাকুলি করছে, সে এক অপূর্ব ব্যাপার মিষ্টি খাওয়া খাওয়ানো হচ্ছে। আমি আমার সাথে যারা ছিল তাদের নিয়ে হেডকোয়ার্টারে দেখা করলাম, হেডকোয়ার্টার ছিল তখন খুলনা সার্কিট হাউজের অপজিটে সবুর খানের একটা ক্লাব নাম ইউনাইটেড ক্লাব সেখানে। আমরা সেখানে অবস্থান নিলাম, মেজর সাহেবের সাথে দেখা করলাম তার সাথে সালাম বিনিময় হলো, উনি বললেন তোমার এদেরকে ক্যাম্পে পাঠিয়ে দাও, মুক্তিযোদ্ধাদের তখন অস্থায়ী ক্যাম্প ছিল খালিশপুরের পাশে দৌলতপুরে, আমি থেকে গেলাম হেডকোয়ার্টারে এবং আমার সাথের ভাইদের পাঠিয়ে দিলাম মুক্তিযোদ্ধার অস্থায়ী ক্যাম্পে। আমি হেডকোয়ার্টারে ইউনাইটেড ক্লাবে থাকলাম এখানে মেজর জলিল সাহেব থাকতেন আর ক্যাপ্টেন সুলতান উদ্দিন সাহেব থাকতেন দৌলতপুর। যাক ১৮ তারিখ গেল আমি থাকতে লাগলাম, ২২ তারিখে মেজর জলিল সাহেব আমাকে ডেকে বললেন, প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে মেসেজ এসেছে আমি কাল সকালে ঢাকা যাচ্ছি, তাই তোমরা ঢাকার যে কজন আছো তৈরি হয়ে যাও তোমরা আমার সাথে যাবে। দীর্ঘ ৯ মাস পর বাড়িতে

ফিরবো তাই আনন্দে মন উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে। সারাটা রাত আর ঘুমোতে পারিনি, সকালে পাঁচটা গাড়িতে করে আমরা রওয়ানা হলাম। পাঁচ গাড়ির মধ্যে দুইটা গাড়ি যোগাড় করে দিয়েছিলেন তৎকালিন বিএলএফ এর কমান্ডার বর্তমান বাগেরহাট জেলাপরিষদের চেয়ারম্যান কামরুজ্জামান টুকু ভাইয়ের ভগ্নিপতি তখনকার এমপি বারি ভাই, আমার সাথে ছিল তখন অশোক দাস, মুসলে উদ্দিন, আব্দুর রব, সালাউদ্দিন চুন্নু, ইউসুফ এবং বরিশালের আর একটা ছেলে রুহুল আমিন, প্রথম গাড়িতে সামনে বসেছেন মেজর জলিল সাহেব গাড়ি চালাচ্ছে মুসলে উদ্দিন পিছনে আমি এবং ক্যাপ্টেন সুলতান উদ্দিন সাহেব। ঠিক সকাল ৭ টায় আমরা রওয়ানা দিয়েছি। উদ্দেশ্য রাস্তার মধ্যে কোথাও আমরা নাস্তা সেরে নেব। যশোর ঢোকার আগে বসুন্দিয়া মোড়ে এসে দেখি রাস্তায় লাইন দেয়া আর্মি, ব্যাপরটা কি? আমাদেরকে থামালো আমরা সবাই গাড়িগুলি রাখলাম, একজন এসে ড্রাইভারের জানালায় টোকা দিল মুসলে উদ্দিন ভাই জানালা খুললে মেজর সাহেবকে দেখে স্যালুট দিল এবং তার পরিচয় দিল। স্যার আমি লেফটেনেন্ট হিড্ডি, আপনার জন্য স্যার একটা মেসেজ আছে, মেজর মঞ্জুর সাহেব আমাকে পাঠিয়েছেন আমাদের সাথে আপনাকে সার্কিট হাউজে যেতে হবে। মেজর সাহেব তার সাথে কথা না বাড়িয়ে বললেন ঠিক আছে চলো, সামনে লেফটেনেন্ট এর গাড়ি আমাদেরকে স্কট করে নিয়ে যাচ্ছে এবং পিছনে ওদের অনেক গাড়ি। কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা সার্কিট হাউজে গিয়ে হাজির হলাম। আমাদেরকে নিয়ে একটা বড় হল রুমে বসানো হলো। আমরা সবাই ওখানে বসলাম, ১০/১২ মিনিটের মধ্যে ওখানে খুব স্মার্ট একজন অফিসার ঢুকলেন এসে বললেন আই এম মেজর মঞ্জুর, মেজর প্লিজ মিট টু মি বলে হাত মিলালেন, তারপর বললেন তুমি তো সব জান এবং বোঝ, আমি শুধু অর্ডারটা পালন করছি। মেজর সাহেবকে একটা চিঠি দেখালেন তিনি হাতে না নিয়ে পড়লেন, পড়ে বললেন ঠিক আছে তুমি তোমার দ্বায়িত্ব পালন কর। মঞ্জু সাহেব বললেন তোমার সাথে যে সব মুক্তিযোদ্ধারা আছে তাদের কাছে আর্মস আছে সেগুলো স্যারেন্ডার করে দাও। আমরা একজন আর একজনের দিকে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম, মেজর জলিল সাহেব ক্যাপ্টেন সাহেবকে বললেন সুলতান সবগুলি আর্মস এদেরকে বুঝিয়ে দাও। মঞ্জুর সাহেব তখন ৮নং সেক্টর কমান্ডার ওনার সাথে ছিলেন ক্যাপ্টেন নাজমুল হুদা। মঞ্জুর সাহেব হুদা সাহেবকে বললেন হুদা তুমি কার কাছ থেকে কি আর্মস পেয়েছো একটা তালিকা করে সব

কিছু উল্লেখ কর। আমরা আর্মস দিয়ে দিলাম তারা তালিকায় উল্লেখ করে নিয়ে নিল। আমাদের সাথে পাচঁজন আর্মি কমিসন্ড অফিসার ছিলেন, একজন ক্যাপ্টেন, চার জন লেফটেনেন্ট এর মধ্যে একজন ডাক্তার ছিলেন, আর মেজর জলিল সাহেব ছিলেন। এই পাঁচ জন এবং মেজর সাহেবকে আমাদের কাছ থেকে নিয়ে চলে গেলেন, মেজর সাহেবের সাথে আমাদের বিচ্ছেদ হয়ে গেল। ওনার সাথে আর আমাদের দেখা হয়নি, কোথায় ছিলেন, কেমন ছিলেন,আমরা জানতাম না। আমরা যে ঘরের মধ্যে ছিলাম আমাদেরকে সেখানেই থাকার ব্যাবস্থা করা হলো এবং বলল পরবর্তী নির্দেশ না আসা পযর্ন্ত আপনাদেরকে এখানে থাকতে হবে। আমরা কনর্ফাম হয়ে গেলাম বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর আমরাই প্রথম রাজবন্দী। যাহোক বাইরের কারো সাথে আমাদের কোন যোগাযোগ নেই, পাশাপাশি দুটো রুমে আমাদেরকে থাকতে দিয়েছে আমরা ফ্লোরিং করে থাকি। দিন যেতে থাকলো, আমরা ২৩ তারিখে এ্যারেষ্ট হয়েছি, ডিসেম্বর মাস গেল জানুয়ারী মাস যেতে থাকলো হঠাৎ জানুয়ারীর ৮ তারিখে আমরা শুনতে পেলাম বঙ্গবন্ধু মুক্তি পেয়েছেন উনি লন্ডন যাচ্ছেন, আমাদের মনের মধ্যে ক্ষীণ একটা মুক্তির আলো জ্বললো, বঙ্গবন্ধু যখন মুক্তি পেয়েছেন তখন আমাদের কিছু একটা ব্যবস্থা করবেন। আমরা ৯টা মাস অনেক সম্মুখ যুদ্ধ করেছি আমাদের মধ্যে অনেক মুক্তিযোদ্ধা চলে গেছেন, এত কষ্ট করেছি দেশের জন্য তার পরেও কেন আমরা এরেষ্ট হলাম কারো কাছে কোন জবাব পেলাম না, কি আমাদের অপরাধ আমরা কি করেছি? ১০ তারিখ বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরলেন আমাদের সাথে বাইরে কারো কোন যোগাযোগ নেই এর মধ্যে ডিসেম্বরের ২৫ বা ২৬ তারিখ হবে পত্রিকায় খবরটা প্রকাশিত হয়েছিল যে যশোরে মেজর জলিল তার দলবল সহ গ্রেপ্তার। খুব সংক্ষিপ্ত খবর ছিল সেটা পড়েছিলাম। ১২ তারিখ বঙ্গবন্ধু প্রধানমন্ত্রীর শপথ নিলেন, ১৬ তারিখ সকালে আমরা ঘুমের থেকেও ঠিক মতো উঠিনি এমন সময় দরজায় টোকা পড়লো, দেখি সেন্ট্রি, সে বললো, স্যার আপনারা সবাই ড্রয়িং রুমে আসুন মেজর সাহেব এসেছেন। ঠিক আছে আসছি, আমরা তৈরি হয়ে সকলে গেলাম ড্রয়িং রুমে। দেখলাম ৮নং সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার মেজর মঞ্জু সাহেব বসে আছেন ওনার সাথে ক্যাপ্টেন নাজমুল হুদা যিনি ৭ নভেম্বর সিপাহি বিদ্রোহে হত্যা হয়েছিলেন আর মেজর মঞ্জুরকে জিয়া হত্যা মামলায় ফাঁসি দেয়া হয়েছিল। মেজর মঞ্জুর বললেন, আপনারা দেশের সূর্য্য সন্তান দেশ যতদিন থাকবে ততদিন বাংলার জনগণ

আপনাদের সম্মান করেবে কিন্তু আপনাদের এই যে দুঃখ জনক অধ্যায়টা সংঘটিত হয়েছে আমার হাতে, আপনারা বিশ্বাস করেন আমি আজও জানি না কেন আপনাদেরকে এতদিন বন্দি রাখা হলো, আপনাদের অন্যায়টা কি? আমি সুলতান সাহেবকে চিনি, মেজর জলিল সাহেবকে চিনি, ৯ টা সেক্টরের মধ্যে যুদ্ধে পারদর্শী মেজর জলিল যার নাম বিবিসি থেকে প্রচার হতো, আজকে উনি কেন বন্দী হয়ে থাকবেন? যাহোক ঢাকা থেকে মেসেজ এসেছে অবিলম্বে আপনাদেরকে গণভবনে পৌছে দেবার জন্য। আপনারা ঢাকা কয়জন যাবেন? রুহুল আমিন বলল আমি এখান থেকে বরিশাল যাবো তাই ওকে বাদ দিয়ে ক্যাপ্টেন সুলতানকে বললেন তোমার ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত আসে নি তাই তোমাকে ছাড়া বাকি সকলকে পৌঁছে দিতে হবে। কিন্তু একটু সমস্যা আছে আমাকে আজকের মধ্যেই গণভবনে পৌছিয়ে দিতে কিন্তু আমাদের যে হেলিকপ্টার আছে সেটা ৪ সিটের, আপনারা এখানে ১২ জন, আমার নিয়ে যাওয়াটা একটা কষ্টকর ব্যাপার হয়ে যাবে। তাই কিছু মনে করবেন না। আমি একটা গাড়িতে করে আপনাদেরকে পাঠাচ্ছি, উনি একটা মাইক্রোবাস ঠিক করে দিলেন আমরা রওয়ানা হলাম ৯ টার দিকে, ক্যাপ্টেন সুলতান ভাইকে রেখে আমাদের যেতে মনটা চাইছিল না তার পরেও উপায় নাই তাই ওনাকে রেখেই রওয়ানা হলাম। ঢাকা এসে সাড়ে চারটার দিকে পৌছলাম, রাস্তার মধ্যে আরিচা পার করার জন্য আমাদের জন্য বিশেষ ফেরির ব্যবস্থা ছিল, আমাদেরকে নিয়ে যাওয়া হলো গণভবনে, আমরা আসার সময় আমাদের যার যার আর্মস বুঝিয়ে দেয়া হয়েছিল তালিকা দেখে। গণভবনে ঢোকার সময় একজন সিকিউরিটি বললেন আপনারাতো আর্মস নিয়ে ভিতরে যেতে পারবেন না, তাই আর্মস গাড়ির ভিতরে রাখুন আমরা এগুলো পাহারা দিব। আমরা সেগুলো রেখে ভিতরে গিয়ে দেখি আমাদের জন্য অধির আগ্রহে অপেক্ষা করছেন নারায়নগঞ্জের কয়েকজন নেতাকে নিয়ে মনির ভাই। মনির ভাই বললেন আমরা ১২ টা থেকে তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছি। তখন বুঝলাম আমাদেরকে মুক্ত করার জন্য কার চেষ্টা ছিল। মনির ভাই বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করে আমাদের সম্পর্কে বলেছিলেন যে আমার সাথে তারা ট্রেনিং করেছে, আমার সাথে যুদ্ধ করেছে, তারা কি অন্যায় করেছে, তারা আমার সাথে ছিল, আজকে প্রায় একমাস যাবৎ তাদেরকে বন্দী করে রাখা হয়েছে যশোরে? বঙ্গবন্ধু সব কিছু শুনে তাড়াতাড়ি মন্ত্রীকে বললেন আমি চাই আজকে এ্যাজ আরলি এ্যাজ পসিবল তাদেরকে আমার সামনে হাজির করা হোক।

ওখানে গিয়ে দেখলাম অনেক নেতা, মন্ত্রী যারা আছেন, তাজউদ্দিন সাহেবও সেখানে ছিলেন, আমরা সবাই বঙ্গবন্ধুকে এক এক করে গিয়ে সালাম করছি কিন্তু আমি বঙ্গবন্ধুকে সালাম করার সময় আমি নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারলাম না। আমি বাচ্চাদের মতো হাউমাউ করে কান্না শুরু করলাম, ওখানে যত লোক ছিল সবাই চুপ হয়ে গেল, আমি যার নির্দেশে, যার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে যুদ্ধ করেছি তার সামনে আমি দাড়িয়ে, একটা হিমালয়ের সামনে যেমন একটা মহিষের শাবক ঠিক তেমনি আমি। আমি আর আমার আবেগটা ধরে রাখতে পারিনি, আমি বঙ্গবন্ধুর পা জড়িয়ে ধরে অনবরত হাউমাউ করে কেঁদে যাচ্ছি, তখন আমাকে মনির ভাই ও শ্রদ্ধেয় মরহুম মেয়র হানিফ সাহেব ওনারা আমাকে জোর করে উঠালেন। আমি উঠে বঙ্গবন্ধুর দিকে যখন চেয়েছি ওনার চোখটাও ছলছল করছে, উনি মনির ভাইকে বললেন, মনির তুই বাসায় নিয়ে যা, ওকে সময় করে আমার কাছে নিয়ে আসবি। আর উনি কোন কথা বলতে পারলেন না। পাশের রুমে আমাদের খাবার ব্যাবস্থা করেছিলেন আমাদের সেখানে নিয়ে গেলেন। আমরা আবেগে এতো আপ্লুত হয়ে গিয়েছিলাম যে আমরা ওখানে কেউই তেমন খেতে পারলাম না। যাহোক ওখান থেকে রওয়ানা হলাম। ইউসুফকে আমি বললাম তুমি কি নারায়নগঞ্জ যাবা, না এখান থেকে চলে যাবা? ও বললো স্যার আমি তাহলে এখান থেকে বাড়িতে চলে যাই? আমি দুইশত টাকা তাকে দিলাম সে ওখান থেকে রওয়ানা হয়ে গেল। আমি, মুসলে উদ্দিন ও আব্দুর রব আমরা তিনজন মনি ভাইদের সাথে নারায়নগঞ্জ চলে আসলাম। ক্যাপ্টেন সুলতান সাহেবের ভাই সালাউদ্দিন আহম্মেদ চুন্নু কাপাশিয়ায় থাকতো সে কাপাসিয়ায় চলে গেল। আমরা বাসায় এসে পৌঁছলাম। কিন্তু যুদ্ধের পরে আজকে ৫০ বছর চলে গিয়েছে, একটা জিনিস আমাকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে, সেটা হলো কেন আমাদের গ্রেপ্তার করা হলো? বহু চেষ্টা করে বিষয়টা জানতে পারিনি, পরে মেজর জলিলের নামে কিছু অভিযোগ দিয়ে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে আর্মি ট্রাইবুনালে ওনার বিচার হয়েছিল সেখানে ট্রাইবুনালের চেয়ারম্যান ছিলেন আর একজন সেক্টর কমান্ডার একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা কর্নেল তাহের সাহেব। মেজর জলিলের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ ছিল তিনি তা মিথ্যা প্রমাণ করে ৭/৮ মাস পর জেল থেকে বের হয়ে এসেছিলেন।

আমি আজও চিন্তা করি আমি কাকে জিজ্ঞাসা করবো? কে আমাকে এই প্রশ্নের উত্তর দিবে? যুদ্ধের পরে বিনা দোষে, কার ষড়যন্ত্রে, কার কারণে, কার পাপে এতোগুলো দিন বন্দী অবস্থায় আমরা কাটিয়েছি?

যুদ্ধের পরে ৯নং সেক্টরের কমান্ডারদের সাথে মেজর জলিল।

বাম থেকে ডানেঃ অশোক দাস, শাহ নেওয়াজ জামান আজাদ, ক্যাপ্টেন সুলতান উদ্দিন আহমেদ, মিজানুর রহমান বাচ্চু (সোয়েটার পরা), ডাঃ আঃ খালেক, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বৈরী স্বাক্ষী ক্যাপ্টেন কামাল উদ্দিন, ক্যাপ্টেন আলামিন, ক্যাপ্টেন খোরশেদ, মেজর মেহেদী, মেজর এমএ জলিল, সার্জেন্ট জহুরুল হকের সাথে গুলিতে আহত ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হক।

- স্বার্থপর লোকগুলো কখনোই দুঃখের ভাগ বহন করে না।

৪৬ বছর পর দেখা হল রণাঙ্গনের দুই মুক্তিযোদ্ধার সাথে

এক এক জনকে খুঁজে বের করতে আমার অনেক দিন লেগে গেছে, তাই সকলের কথা এক সাথে বলতে পারবো না। প্রায় ২000 সালে এসে আমার মনে পড়লো কে কোথায় আছে কেউ তো কোনো যোগাযোগ করলো না, তাই প্রথম আমিই খুঁজতে শুরু করলাম। আগের একটা বক্তব্যে বলেছি ইউসুফকে কিভাবে খুঁজে বের করলাম, ইউসুফকে খুঁজে বের করতে গিয়ে ওর মুলাদী থানার মুক্তিযোদ্ধার লিষ্ট টা বের করলাম, এটা বের করতে গিয়ে আমাকে খুলনা যেতে হয়েছে, খুলনায় এক হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার আছেন উনি মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন খালিশপুরে থাকেন। তার কাছ থেকে আমি তালিকা বের করলাম এরপর ইউসুফকে খুঁজে বের করলাম, আমাকে এ ব্যাপরে সাহায্য করেছিল নাজিরপুর থানা কমান্ডার, গৌরনদী থানা কমান্ডার এবং বরিশালের জেলা কমান্ডার, ইউসুফ তখন ইঞ্জিনিয়ার এবং পৌরসভা চেয়ারম্যান, তার সাথে যোগাযোগ করলে বললেন স্যার আমি তো আপনাকে অনেক খুঁজেছি, পাইনি এবং আমি শুনেছি আপনাকে মেরে ফেলেছে। এখানে আর একটু বলে নেই আমার নারায়নগঞ্জে আর একজন বিএলএফ এর কমান্ডার ছিলেন তার নাম নূরু মিয়া চৌধুরী বাচ্চু তাকে ৮৮ সালে আততায়ীরা হত্যা করে, আর সেজন্যই আমার পরিচিত যারা আছে তারা মনে করেছিল আমাকে মেরে ফেলেছে। যাহোক ইউসুফের সাথে স্বাক্ষাত হলো। ২০০৯ বা ২০১০ থেকেই আমার একটা সন্দেহ হয়েছিল, আমার যে তৎকালিন জেলা পরিষদের প্রশাসক এবং বর্তমানের নারায়নগঞ্জ এর জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি, আমার বাল্যবন্ধু আব্দুল হাই, আমি তাকে বললাম এই যে রুহুল আমিন ছেলেটা এরশাদের মহাসচিব, আমার কেন জানি মনে হয় ক্যাম্পে আমার সাথে একটা ছেলে ছিল তার নাম রুহুল আমিন আর এই ছেলেটাই সেই ছেলে হবে। হাই সাহেব বললেন ঠিক আছে চলেন তাকে জিজ্ঞাসা করেন, আমি বললাম সে এখন একটা পার্টির মহাসচিব, তারপর একজন মন্ত্রী, না এভাবে যাওয়াটা ঠিক হবে না, তখন সে লম্বা চওড়া এমনি ছিল কিন্তু তার ওজন হবে ৫০ কেজির মতো, আর এখন যে রুহুল আমিন হাওলাদার তার ওজন হবে ১০০ কেজি, যাহোক চিন্তার ভিতর অনেক কিছু থাকল। কিছুদিন পর একটা সুযোগ আসলো তার সাথে কথা বলার, আমাদের নারায়নগঞ্জ ২এর ৭০ এর একজন আওয়ামীলীগ নেতা আমাদেরও নেতা বর্তমান জাতীয়পার্টির প্রেসিডিয়াম

সদস্য আলমগীর সিকদারের আব্বা ডাঃ সাহাদাত আলী সিকদার। তিনি মারা গেলেন ২০১৭ তে তার কুলখানির দিন আমাদের জেলা কমিটির সব নেতা হাজির হয়েছি, সেখানে এরশাদ সাহেবের জন্য এস্টেজ করা হয়েছে, এরশাদ সাহেব সেখানে গিয়েছেন, একটা ড্রইং রুমে বসে আছি মুখোমুখি সোফা। আমার ঠিক সামনে জিএম কাদের, জিএম কাদেরের সাথে বসে আছেন জেনারেল এরশাদ সাহেব, তাদের সাথে বসে আছেন মুজিবুল হক চুন্নু তাদের পাশে বসে আছেন রুহুল আমিন হাওলাদার, আরও ওনাদের নেতৃবৃন্দ।

৪৬ বছর পর দুই মুক্তিযোদ্ধার দেখা

দুজনেই রণাঙ্গণের বীর সেনানী। ৯ নং সেক্টরে যুদ্ধ করেছেন জীবনবাজি রেখে। বীরমুক্তিযোদ্ধা না'গঞ্জ জেলা আওয়ামীলীগের সিনিয়র নেতা মিজানুর রহমান বাচ্চু ও জাতীয় পার্টির মহাসচিব বীরমুক্তিযোদ্ধা রুহুল আমীন হাওলাদের সাথে দেখা হয় গতকাল। মাঝখানে পেরিয়ে গেছে ৪৬ টি বছর। রণাঙ্গণ থেকে স্বাধীনতা। প্রায় অর্ধশত বছর পর দেখা হওয়ায় দুজনেই আবেগ আপ্লুত হয়ে পড়েন। ছবিটি ক্যামেরা বন্দি করেছেন আমাদের নিজস্ব আলোকচিত্রী কেএইচ মিলন।

আমি তখন আব্দুল হাই সাহেবকে বললাম আমি কি ওনাকে জিজ্ঞাসা একটা কথা করবো? হাই সাহেব বললেন বলেন, বলেন না। আমি অনেক ইতস্ততার মাঝে বললাম এক্সকিউজ মি, তখন যারা কথা বলছিল তারা চুপ হয়ে গেলে আমি বললাম হাওলাদার সাহেব আমি কি আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে পারি? তিনি বললেন হ্যা বলেন। আমি বললাম আপনি কি একজন মুক্তিযোদ্ধা? তিনি বলেলন হ্যা আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা। আমি আবার বললাম আপনি কি ট্রেনিং নিয়েছেন চাকুলিয়াতে? তিনি বললেন হ্যা। আচ্ছা আপনি কি বাগুন্ডি ক্যাম্পে ছিলেন, তিনি বললেন হ্যাঁ আমি বাগুন্ডি ক্যাম্পে ছিলাম। ওখানে আপনার সাথে একজন মুক্তিযোদ্ধার পরিচয় হয়েছিল নাম মিজানুর রহমান বাচ্চু সাহেব, তিনি বললেন হ্যাঁ ওনাকে চিনবো না কেন উনি খুব উঁচু মানের একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন, সুলতান সাহেবের তাবুতে থাকতেন প্রায়ই উনি আমাকে ডেকে নিয়ে

খাওয়াতেন। দেখলাম জেনারেল এরশাদ সাহেব সহ সকলে আমাদের কথা খুব মনযোগ দিয়ে শুনছেন। আপনি তো বাচ্চু সাহেবের সাথে আর যান নি, আপনি মেজর সাহেবের সাথে খুলনা দৌলতপুর গিয়েছিলেন সেখানে ক্যাম্প করেছিলেন এবং ঢাকা আসার পথে মেজর সাহেবের সাথে যশোরে এ্যারেস্ট হয়েছিলেন কথাটা ঠিক? তিনি বললেন হ্যা ঠিক, এর পর যেদিন রিলিজ হন সেদিন বাচ্চু সাহেব আপনাকে সাথে করে ঢাকা নিয়ে যেতে চাইলে বলেছিলেন এখান থেকে আপনার যেতে সুবিধা হবে, সেদিন ওখানে ছিলেন একমাত্র ক্যাপ্টেন সুলতান সাহেব, রাইট? তিনি বললেন রাইট। তো হাওলাদার সাহেব আপনাকে একটা প্রশ্ন করি, আপনি তো জীবনে অনেক প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, আপনি প্রায় ৮/৯ বছর মন্ত্রী ছিলেন, জাতীয় পার্টির মত একটি পার্টির মহাসচিব একবারও কি সেই বাচ্চু সাহেবের কথা আপনার মনে পড়েনি? আপনাকে কি সে কোন উপকার করেন নাই? তিনি বললেন, বলেন কি ভাই উপকার করেনি মানে, একদম মায়ের কোলে যে ভাবে বাচ্চা রেখে মা আদর করেন তিনি ঠিক সেই ভাবে আমাকে আদর করেছেন। আসলে কাজের চাপে খবর নিতে পারি নি কিন্তু যখন খবর নিয়েছি আমাদের ওখানকার এমপি নাসিমের কাছে, নাসিম বলেছিল ওনাকে তো মেরে ফেলেছে? তখন তিনি বললেন ভাই আপনার পরিচয়টা দিলেন না, আপনি কে? এতোকিছু জানেন কিভাবে? আমি বললাম আজকে নাই দিলাম। যখন আপনার স্মৃতি থেকে হারিয়ে গেছে তখন থাক। তিনি বললেন না ভাই আপনি কে? আমি ভাবছিলাম পরিচয়টা দেব না কিন্তু হাই সাহেব বলে উঠলেন আরে উনিই তো সেই বাচ্চু সাহেব। এবার হাওলাদার সাহেব উঠে এসে জড়িয়ে ধরে বললেন আমি চিনতে পারি নি আমাকে মাফ করে দিবেন, তখন এরশাদ সাহেব বললেন কি হাওলাদার? খুব ভালো লাগতাছে, হাওলাদার বললেন জি স্যার উনি আমার কমান্ডার ছিলেন খুব উঁচু মানের মুক্তিযোদ্ধা। এরশাদ সাহেব বললেন মুক্তিযোদ্ধা তো আর উচু নিচু নেই সবাই কাধে কাধ মিলিয়ে যুদ্ধ করেছেন, হাওলাদার বললেন, না স্যার উনি কমান্ডার ছিলেন আমাদের সকলকে উনি ট্রেনিং দিয়েছেন, আপন ভাইয়ের মতো স্নেহ করতেন। এবার এরশাদ সাহেব আমাকে বললেন আপনার কেমন লাগছে? আমি বললাম বুঝতেই পারছেন আজ থেকে ৪৭ বছর আগে একটা বাচ্চা ছেলে ছিল, কেন যেন আমার ওকে দেখে খুব মায়া লাগতো, কোনো কথা বলতো না চুপচাপ থাকতো ডিউটি খুব সিনসিয়ারভাবে করতো, কোন নেশা ছিল না পান বিড়ি সিগারেটের, আমাদেরে সাথে খাবার খেতে বসাতে চাইলেও সে ইতস্ত বোধ করত সুলতান সাহেব ধমক দিলে সে বসতো

আমাদের সাথে। যাহোক এবার খাবার খেতে খেতে এরশাদ সাহেব বললেন আপনি একবার আমার অফিসে আসবেন আমি আপনার কাছে অনেক কথা শুনবো, হাওলাদার তুমি তাকে নিয়ে আসবা। এর ফাঁকে কিভাবে যেন ছবি তোলা হলো পরের দিন ছবিসহ পত্রিকায় আসলো “৪৭ বছর পর দেখা হলো দুই মুক্তিযোদ্ধার” শিরোনামে খবরটা আমাকে খুব আকৃষ্ট করলো।

- লেবু বেশি চিপলে যেমন তেতো হয়ে যায় তেমন কেউকে বেশি ভালোবাসলে তার অহঙ্কার বেড়ে যায়।

আজও মনে পড়ে আমার, তাদের কথা

আজকের এই পর্বে আমি বেশ কিছু মুক্তিযোদ্ধা যাদের সাক্ষাৎ পেয়েছি, তাদের কথা বলবো। প্রথমে উল্লেখ করবো তখনকার সময় আমাদের ৯নং সেক্টর এর সেক্টর কমান্ডার এর সাথে ছায়ার মত সবসময় যিনি সঙ্গ দিয়েছেন তার নাম ওবায়দুল রহমান মোস্তফা। উনি এরশাদের শাসন আমলে ডিআইজি হয়েছিলেন। ডেপুটি এটর্নি জেনারেল, হাইকোর্ট এ প্রাক্টিস করেন। ওনার সাথে দেখা হওয়ার পর আমি সত্যিই অভিভূত হয়েছি। উনি আমাকে জড়িয়ে ধরে অনেক কথা বলেছেন। আজ প্রায় ৫০ বছরের বেশি হয়ে গেল তার সাথে আমাদের স্মৃতি, আমার ইদানিং যাদের কথা খুব বেশি করে মনে পড়ে বাকুটি ক্যাম্পে ছিলেন এয়ার ফোর্সের মুজিব ভাই। তিনি একজন চৌকস মুক্তিযোদ্ধা আর সত্যিকার একজন ফাইটার। উনি ছিলেন শাজাহান ওমর এর সাথে বরিশালের পটুয়াখালী, বরগুনা এসব সাইটে। বিভিন্ন যুদ্ধে উনি শাহজাহান ওমর এর সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। উনার সাথে আমার প্রায়ই যোগাযোগ হয়। এই মাসেও উনার সাথে যোগাযোগ হয়েছে। আমার খুব মনে পড়ে এয়ার ফোর্সের আরেক জন সলিমুল্লা ভাই এর কথা, অনেক দিন তার সাথে আমার যোগাযোগ নাই। উনি বেঁচে আছেন কি না তাও আমি জানি না। আমি মতিন ভাই কে জিজ্ঞাসা করেছি যে সলিমুল্লা ভাই এর কোনো খবর আছে? উনি আমাকে বলেছেন বাচ্চু ভাই আমার সাথে প্রায় দুই বছর আগেও ওনার যোগাযোগ ছিল। এখন কোন যোগাযোগ নাই, বেচেঁ আছেন কি-না তাও আমি জানি না। আমার স্মৃতিতে খুব করে মনে পড়ে ক্যাপ্টেন সুলতান সাহেবের ছোট ভাই সালাউদ্দিন আহমেদ চুন্নুর কথা, তাকে যুদ্ধের সময় আমি আমার সাথে করে বাংলাদেশ থেকে নিয়ে গিয়েছিলাম। উনি টান্ডুয়ায় ট্রেনিং করেছিলেন, বিএলএফ ট্রেনিং। উনি ইন্তেকাল করেছেন। আমি তার মাগফিরাত কামনা করছি। হঠাৎ করে আমাদের মাঝ থেকে চলে গেলেন আর একজন ক্যাপ্টেন খোরশেদ ভাই। খোরশেদ ভাই এর সাথে আমার মনে হয় এক দেড় বছর বা করোনার আগেই যোগাযোগ হয়েছিল। কিন্তু আমি খবর পেলাম খোরশেদ ভাই ঢাকায় ইন্তেকাল করেছেন। আমি তার মাগফিরাত কামনা করছি। ফরিদপুর এর সাব সেক্টর কমান্ডার ছিলেন আমাদের শ্রদ্ধেয় নূর মোহাম্মদ ভাই। যিনি ক্যাপ্টেন বাবুল নামে পরিচিত, আমার

সাথে যোগাযোগ আছে এবং দুই তিন দিন যাবৎ আমি খুব চেষ্টা করছি উনার টেলিফোন নম্বরটা আবার নিতে।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার উনি আসামি ছিলেন। আমি বলছি উনি একজন অত্যন্ত সাহসি ও চালাক যোদ্ধা ছিলেন। উনি আজ বার্ধক্যে উপনীত হয়েছেন। নব্বই এর কাছাকাছি ওনার বয়স। হঠাৎ করে নারায়নগঞ্জে আমার বাড়িতে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। বছর চার পাঁচেক আগে হবে। আমি তো ওনাকে দেখে অবাক হয়ে গেলাম। আমি নিজেকে ধন্য মনে করলাম। যে বাবুল ভাই আমার বাসায় এসেছেন। কুশল বিনিময় করলাম। উনি আমাকে বললেন তোমার এখানে আমার একটা সমস্যা আছে। তুমি সমস্যাটা আমাকে সমাধান করে দিবে। আমি আলাপ আলোচনার মাধ্যমে তার সমস্যা শুনে সমাধান করে দিয়েছি। আজকে মনে পড়ে অনেক কথা এবং অনেক খারাপ লাগে যখন আমি আমার সহযোদ্ধাদের কথা মনে করি। আমার সেক্টর এর মেজর জলিল সাহেবের সব সময় সাথে ছিলেন এবং ওনার গাড়িটা চালাতেন আমাদের এক ছাত্রনেতা, তোলারাম কলেজে ৭০ এ যে প্যানেল হয়েছিল ছাত্র-ছাত্রী সংসদের বেসামরিক সিভিল ডিফেন্স এর সম্পাদক ছিলেন মোসলে উদ্দিন। বয়সে তিনি আমাদের ৫-৬ বছরের বড় কিন্তু তার সাথে অত্যন্ত আন্তরিক বন্ধুত্ব আছে। তুই সম্বোধন করে আমরা কথা বলি। উনার বয়স এখন ৮২/৮৩ হবে। এখন সে বিছানায় পড়ে গেছে আমি তার সামনে গেলে তার সাথে কথা বললে, নিজেকে স্থির রাখতে পারি না। ৭০-এর এরকম সাহসী সৈনিক ফ্রন্ট ফিল্ড এ যে যুদ্ধ করেছে তার আজ এই অবস্থা। সত্যিই খারাপ লাগে অশোক দাশকে দেখলে, তাকে দেখলে মনে হয় মানুষের জীবনের যে একটা মূল্য আছে সে সেটা কোনদিনও চিন্তা করে নাই। তার মনে পড়ে বাকুন্ডি ক্যাম্পে পাক আর্মিরা ইছামতি নদীর অপর প্রান্ত থেকে এসে আক্রমণ করেছিল। সে সময় এক পাক আর্মি তাকে গ্রেনেড হামলা করেছিল। গ্রেনেডটা পানিতে কাদার নিচে চলে গিয়েছিল। গ্রেনেডটা ব্লাস্ট হয়নি। সে দুজন পাক আর্মি কে নিয়ে জলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এবং দুজনের একজনকেও ছাড়ে নি। যখন তাদেরকে ধরে আনা হলো দেখলাম। অশোকের হাইট হবে ৫ ফুট সাড়ে সাত ইঞ্চি। আর যে দুজন আর্মিকে সে ধরেছে তাদের হাইট হবে ৬ ফুট সাড়ে চার ইঞ্চি অসম্ভব লম্বা কিন্তু তারা মার খেয়ে গিয়েছে কারণ তারা সাঁতার জানে না। আর পুকুরের মধ্যে কাদা ছিল। কাদার মধ্যে জাপটে ধরে নিজের জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করে জান

প্রাণ দিয়ে দুজনকে সে রেখে দিয়েছিল। আজকে সেই অশোকের বাকশক্তি আছে কিন্তু স্মৃতি হারিয়ে ফেলেছে। সামনে দেখলে চেনেনা কাউকেই। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে থাকে। আরেক জনের কথা আমার খুব করে মনে পড়ে। তিনি হলো ক্যাপ্টেন মাহফুজ আলম বেগ। ভদ্র লোক নেভিতে ছিলেন। নেভিতে থেকে তিনি নেভির যত গ্রুপ যারা নেভি থেকে শিক্ষা নিয়ে সারা বাংলাদেশে অপারেশন চালিয়েছিল, তাদেরকে যিনি ট্রেনিং দিয়েছিলেন সেই সাহসী যোদ্ধা ক্যাপ্টেন বেগ। আমি তিন চার দিন আগে বললাম, বেগ ভাই আপনার ডেজিগনেশন কি ছিল পাকিস্তান নেভিতে? উনি বললেন পাকিস্তানে কি ছিলাম না ছিলাম সেই পরিচয়টা আমি তোমাকে দিব না। তুমি কোথাও তা প্রকাশ করবা না, I hate Pakistan. পাকিস্তানের সেনাবাহিনীকে ও পাকিস্তানকে আমি ঘৃনা করি। আমার নেতা বঙ্গবন্ধু, আমি বঙ্গবন্ধুর ডাকে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নিয়ে যুদ্ধ করেছি। আমি আমার যতটুকু সম্ভব স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তা দিয়েছি আমি বাংলার স্বাধীনতা আনার জন্য আমি জান প্রান দিয়ে চেষ্টা করেছি এবং আমি সফলতা অর্জন করেছি। তাই পাকিস্তানি নেভিতে কি ছিলাম কোথায় ছিলাম, আমি সে কথা বলতে চাই না। আমার কথা যদি বলতে হয় তুমি বলবে আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলাম। আমি এখনোও দেখি পাকিস্তানিদের উপর তার যে ঘৃণা তা এখনো তিনি ভুলতে পারেননি। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম আমি একটা কথা বলি তাদের উপর আপনার এত ঘৃণা কেন? দেখ বাচ্চু আমি আমার চোখের সামনে মায়ের সামনে মেয়েকে ভাইয়ের সামনে বোনকে রেপ করতে দেখেছি। আমি আরো দেখেছি তারা বেয়নেট দিয়ে দিনের বেলা মানুষকে কুরবানির গরুর মত খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারতে, এরা মানুষ না এরা পশু। তাই আই হেট পাকিস্তান, আই হেট পাক আর্মি। এরা হচ্ছে আল্লাহর শ্রেষ্ঠতম জানোয়ার। দেখলাম উনি উত্তেজিত হয়ে গেছেন। আমি বললাম, ঠিক আছে ভাই আপনি যতটুকু বলেছেন আমি আমার বক্তব্যে ততটুকুই বলবো। তিনি বললেন তুমি বলো আমার কথা। ওনার অনেক বয়স হয়ে গিয়েছে তবু তিনি তার মনের মধ্যে পাকিস্তান বাহিনীর প্রতি ক্ষোভ পুষে রেখেছেন। আমি দোয়া করি উনি সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন। সত্যি এগুলো খুব খারাপ লাগে এবং যারা বেঁচে আছেন তারা যেন সুস্থ থাকেন আর যারা মারা গেছেন তারা যেন জান্নাত লাভ করেন। খুলনার গভর্নমেন্ট কলেজের ভিপি একজন সক্রিয় মুক্তিযোদ্ধা। তিনি মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং ক্যাম্পের অনেক ট্রেনারদের সাথে থেকে এবং সব সময় ক্যাপ্টেন সুলতানের সাথে

থেকে ছায়ার মত যে মুক্তিযুদ্ধে সহযোগিতা করেছিল। তিনি একজন সশস্ত্র যোদ্ধা শাহনেওয়াজ জামান আজাদ চৌধুরী উনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। উনার জন্য তোমরা সবাই দোয়া করো। আমি সহ বর্তমানে যারা জীবিত আছে, তাদের মধ্যে খুব অল্প কয়েকজনের সাথে আমার যোগাযোগ আছে। আমি চেষ্টা করছি, তারা কোথায় আছে, কিভাবে আছে, তাদের খুঁজে বের করার জন্য। খুঁজে বের করলে তাদের খোঁজ পেলে অবশ্যই তোমাদেরকে জানাবো। আর যারা মারা গেছে তাদের রুহের মাগফেরাত কামনা করছি এবং যারা বেঁচে আছে তাদের সুস্থতা কামনা করে তোমাদের সকলের কাছে দোয়া চাইছি তোমরা সবাই দোয়া করবে। জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু জয় হোক সকল মেহনতী মানুষের।

- অহঙ্কার তারাই করে যারা হঠাৎ করে কিছু পেয়ে যায়, যা তার পাওয়ার যোগ্যতা ছিল না।

আমি মন থেকে দোয়া করি আল্লাহ যেন তার স্মরণশক্তি ফিরিয়ে দেন

১৯৯৫ সাল, আমাদের এক নেতাকে আওয়ামীলীগে অংশগ্রহণ করানোর জন্য আমি (শেখ হেলাল তখন উঠতি নেতা এবং নেত্রীর খুব কাছের লোক) তার কাছে নিয়ে যাবার প্রোগ্রাম হলো আমাদের সেই নেতাকে, তিনি হলেন ১৯৯৬ এ নারায়নগঞ্জ ২ আসন থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য এমদাদুল হক ভূইঁয়া। ওনাকে শেখ হেলালের কাছে নিয়ে যাবার প্রোগ্রাম করলেন ফকরুল ইসলাম মুন্সি, তিনি দেবিদ্দারের মন্ত্রী ছিলেন, এমপি ছিলেন, উপজেলা চেয়ারম্যান ছিলেন, তাকে নিয়ে যাবার সময় আমাদের এখানকার অনেক আওয়ামীলীগ নেতা সাথে গিয়েছিলেন। ওনার চেম্বারে যখন আমরা ঢুকেছি তখন আমাকে দেখে বললেন ভাই আপনারা কাকে সাথে নিয়ে এসেছেন? সবাই তো অবাক, সবাই একজন আর একজনের দিকে চাওয়া চাওয়ি করছে, আমি চুপ করে রইলাম। তারপর উনি বলেলন আপনারা বুঝতে পারলেন না? আপনারা ওনাকে জিজ্ঞেস করেন আমি কি অন্যায় করেছিলাম যে মুক্তিযুদ্ধের সময় উনি আমাকে প্রশিক্ষণ দিতে চান নাই। অনেক অনুরোধ করে আমি মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং এর সুযোগ পেয়েছিলাম। তখন আমি বললাম আসল ঘটনাটা সবাইকে খুলে বলো তারা তো আমাকে ভুল বুঝে থাকবে, তোমাকে কেন আমি ট্রেনিং নিতে দেই নি? তুমি এক্সপ্লোসিভ ট্রেনিং নিতে গিয়েছিলে তোমার বয়স তখন ১১ বা ১২ বছর হবে, এতোটুকু বাচ্চা ছেলেকে আমি ট্রেনিং দিতে চাই নি কিন্তু তুমি অসীম সাহসিকতার সাথে ট্রেনিং নিতে গিয়েছিলে। সেটা কি আমি অন্যায় করেছিলাম? যাহোক এটা তখন হাসাহাসির মধ্যে মিটলো। ১৯৯৫ গেল, ২০১৮ তে আমার এলাকার আর একজন কেন্ডিডেট সংসদ নির্বাচনের জন্য নমিনেশন চেয়েছিলেন। তার জন্য আমরা আবার তদবির করতে শেখ হেলালের বাসায় গেলাম। তিনি গুলশানে থাকেন আমরা গেলাম ২০১৮ সালের নির্বাচনের আগে। বাসার সামনে অনেক ভিড় আমরা বসে রইলাম, খবর পাঠালাম, দুই থেকে আড়াই ঘন্ট অপেক্ষার পর আমরা ভিতরে যাবার অনুমতি পেলাম। ভিতরে গিয়ে দেখলাম উনি ড্রইং রুমে বসে আছেন ওনার সাথে বিভিন্ন জায়গার যারা দর্শন প্রার্থী তারা বসে আছেন। আমি আর আমার সাথে ছিলেন বর্তমানের আড়াইহাজারের উপজেলা চেয়ারম্যান হ্যালো সরকার এবং আমাদের প্রার্থী ইকবাল পারভেজ, প্রায় এক ঘন্টা

তাদের কথা শোনার পর তারা যখন বিদায় হলো তখন আমাদেরকে বললেন, কি ব্যাপার আপনারা কি কিছু বলবেন, আমি বললাম হ্যাঁ বলবো। আমি বললাম আপনি কি আমাকে চিনতে পেরেছেন? হেলাল সাহের বললেন, না-তো আপনাকে আমি চিনলাম না। আমি বললাম আপনি মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিংটা কোথায় নিয়েছেন? তিনি বললেন আমি মুক্তিযুদ্ধেরে ট্রেনিং কোথায় নিয়েছি ৫০ বছর আগের কথা আমার মনে নেই, আমি বললাম বাগুন্ডি ক্যাম্পের কথা আপনার মনে নেই? মেজর জলিল সেক্টর কমান্ডার ছিলেন ক্যাপ্টেন সুলতান ক্যাম্প ইনচার্জ আপনি ওখানে ট্রেনিং নিয়েছেন আপনার মনে নেই? তিনি বলেলান না আমার এগুলো মনে নেই আমি কোথায় ট্রেনিং নিয়েছি কোথায় মুক্তিযুদ্ধ করেছি আমার এগুলো কিছু মনে নেই। আমি রীতিমতো কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলাম। আমরা নিজেদের মধ্যে চাওয়া-চাওই করলাম তো আমি এখানে আর এবিষয়ে কথা বলার প্রয়োজন মনে করলাম না চুপ করে বসে থাকলাম। তারপর ইকবাল সাহেবের সাথে বেশ কিছু কথা বলার পরে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন দেখুন আপনি কিছু মনে করবেন না আসলেও আমি সব ভুলে গিয়েছি, ৫০ বছর হয়েছে, আমার মেমোরির মধ্যে কিছু নেই, আপনি বলেন কি বলবেন? আমি বললাম না আমার কিছু বলার নেই, আপনি যখন মনেই করতে পারছেন না আপনি একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন কি না, কোথায় ট্রেনিং করেছেন? তাই এগুলো এখানে টানাটাও অপ্রাসঙ্গিক। আমি চুপ করে বসে থাকলাম। এরপর চা এলো, চা খাওয়ার বেশ কিছুক্ষণ পর উনি আবার আমাকে বললেন ভাই আপনি দুঃখ নেবেন না বিশ্বাস করেন আমার কিছু মনে নেই, আমি কোথায় মুক্তিযুদ্ধ করেছি, কোথায় ট্রেনিং নিয়েছি, প্লিজ ভাই আপনি কিছু মনে করবেন না। আমি বললাম না আমি মনে করবো না, তবে দুঃখই লাগে আপনি এই বয়সে এসে সব কিছু ভুলে গেলেন? তবে আমি আপনার জন্য দোয়া করি আল্লাহ আপনার স্বরণশক্তি ফিরিয়ে দিক আপনি আবার সবকিছু যাতে মনে করতে পারেন। তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসলাম, আসার সময় আমার মনটা স্বাভাবিক ভাবে খারাপ কারণ, অত্যন্ত উৎসাহ নিয়ে গিয়েছিলাম আমি একটা ভালো তদবির করবো কারণ উনি আমার হাতে ট্রেনিং নিয়েছেন। বর্তমানে একজন প্রভাবশালী নেতা ওনার কাছে আমার দাবী ছিল, ওনার কাছে আমি জোর দিয়ে বলবো, তোমার কাছে আজকে ক্ষমতা আছে তুমি আজকে আমাদের এই কাজটা করে দিবে। আমি অনেক আশা নিয়ে গিয়েছিলাম তার কাছে কিন্তু ব্যর্থ মন নিয়ে ফিরে আসলাম,

আমি চুপ করে এদের সাথে এসে গাড়ীতে বসলাম, এরাও আর কোনো কথা বললো না, অনেকক্ষণ পর ইকবাল আমাকে বললো মামা কি করবেন উনি যখন সব ভুলে গিয়েছেন তখন এখানেতো আর কিছু বলার নেই, আমি বললাম না ওটা না আমি একা এসে যদি কথাটা শুনতাম তাহলে কথাটা সহ্য করতে পারতাম। যাহোক তার জন্য দোয়া করতে করতে আমি ফিরে এলাম আল্লাহ যেন তাকে স্বরণশক্তি ফিরিয়ে দেন, তিনি যেন মনে করতে পারেন মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি।

- পৃথিবীতে সবচেয়ে কঠিন হচ্ছে মানুষ চেনা।
- সুন্দর বন আর সুন্দর মন দুটোই বিলুপ্তির পথে।
- পরের উপকার করা ভালো কিন্তু নিজেকে পথে বসিয়ে নয়।

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কিছু না বলা কথা

আজ হতে শত বছর আগে গোপালগঞ্জের টুঙ্গীপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন আজকের বাংলাদেশের স্থপতি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধুর জন্মের সময় তার মা-বাবার উপস্থিতিতে মুখে মধু দিয়ে তার নানা বলেছিলেন তোমরা দেখে নিও আমার নাতি জীবনে অনেক বড় হবে। কিন্তু নাতি যে কত বড় হবে, কোথায় গিয়ে নাতির সীমানা শেষ হবে এটা বঙ্গবন্ধুর নানা আর ধারণা করতে পারেন নাই এবং দেখেও যেতে পারেন নাই। তবে ভাগ্য ভাল বলতে হবে বঙ্গবন্ধুর পিতা এবং মাতার। বঙ্গবন্ধুর জীবনের উত্থান তার পিতা এবং মাতা দেখে গিয়েছেন। জীবনভর ওনারা ওনাদের খোকাকে (বঙ্গবন্ধুর ছোটবেলায় ডাক নাম ছিল খোকা) নিয়ে অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন। বিভিন্ন সময়ে বঙ্গবন্ধু জেলে গিয়েছেন এবং বিভিন্নভাবে উনারা টেনশনে থাকতেন। তাদের শেষ জীবনে বঙ্গবন্ধুকে দেখেছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে, রাষ্ট্রপতি হিসেবে এবং বাংলাদেশের জাতির পিতা হিসেবে, এটাই উনাদের জীবনের সফলতা। আজকের এই দিনে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে আমার অনেক স্মৃতির কথা মনে পড়ে। আমি বঙ্গবন্ধুকে প্রথম দেখেছি ১৯৫৩ সালে, মাসটা আমার ঠিক মনে নেই তবে জুলাই-আগস্ট হবে। বঙ্গবন্ধু বগুড়ার আলতাফুন্নেসা মাঠে জনসভা করতে গিয়েছিলেন। আমার আব্বা সরকারি চাকরিরত অবস্থায় বগুড়ায় ছিলেন আমাদের বাসার কাছেই বগুড়ার সেই বিখ্যাত আলতাফুন্নেছা মাঠ। সেই মাঠে আমি বঙ্গবন্ধুর জনসভা দেখতে গিয়েছিলাম। সেদিন বঙ্গবন্ধুর সাথে স্টেজে ছিলেন বাংলার আর এক বাঘ শেরে বাংলা একে ফজলুল হক সাহেব। সেদিন কিছু না বুঝলেও মনোযোগ দিয়ে উনার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম বক্তৃতার সময়। বক্তৃতা তো নয় যেন মুখ দিয়ে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বের হচ্ছে। বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতার ভাবার্থ তখন কিছু বুঝি নাই, কিন্তু এটা বুঝেছিলাম যে ওনার বক্তৃতা আমাকে শিহরিত করছে। এরপর আমি বঙ্গবন্ধুকে দেখেছি ১৯৫৬ সালে। আমি তখন ক্লাস থ্রী বা ফোরে পড়ি। উনি নারায়ণগঞ্জের বর্তমানে জামতলা ওখানে একটা ঈদগাহ ময়দান আছে, এই ঈদগাহ ময়দানে বঙ্গবন্ধু মিটিং করতে এসেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর সাথে ছিলেন আতাউর রহমান খান সাহেব, মাওলানা আব্দুর রশিদ তর্কবাগীশ, আরও অন্যান্য নেতারা যাদেরকে আমি তখন চিনতাম না। এখানেও বঙ্গবন্ধু জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়েছিলেন। ইস্কান্দার মির্জা তখন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, তার বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু বক্তৃতা দিয়েছিলেন। আমি

মনোযোগ দিয়ে শুনলাম, খুব ভালো লাগলো আমার ভিতর থেকে বঙ্গবন্ধুর প্রতি একটা টান এসে পড়ল। এরপর বঙ্গবন্ধুকে দেখেছি নারায়ণগঞ্জে এসেছিলেন তখন। বর্তমানে দুই নম্বর রেলগেট-এর সামনে বর্ষণ সুপার মার্কেট ও জনতা ব্যাংক আছে ওখানে তখন মাত্র বালু দিয়ে ভরাট করেছে, ১৯৬২ সালে উনি এখানে মিটিং করলেন, সোহরাওয়ার্দী সাহেব ওনার সাথে ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর পরে ওই মিটিংয়ে সোহরাওয়ার্দী সাহেব কিছু বক্তৃতা দিলেন আমার মনে আছে, আইয়ুব খান তখন দেশের প্রেসিডেন্ট, মার্শাল ল চলে আইয়ুব খানের, সোহরাওয়ার্দী সাহেব তখন বক্তৃতায় বলেছিলেন "নেমক হারাম নেমক হালাল বলে একটা কথা আছে, তুই বেটা আমার বডিগার্ড ছিলি আর তুই আমাকে বেটা জেলে নিলি", এটা উনি বলেছিলেন ক্ষুব্ধ হয়ে কারণ ১৯৫৭ সালে উনি যখন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তখন তার চীফ সিকিউরিটি অফিসার ছিলেন আইয়ুব খান। এরপর বঙ্গবন্ধুকে দেখি ১৯৬৭ সালের বর্তমান চাষাড়া যেখানে জিয়া হল, তখন এটা ছিল বালুর মাঠ, এই মাঠের মধ্যে বঙ্গবন্ধু মিটিং করতে আসলেন, মিটিং এ তিনি বললেন "পাকিস্তানের এক নেতা আছে যারা আগেও খান পরেও খান, খান আব্দুল কাইয়ুম খান, অনেক বড় বড় কথা বলেন কিন্তু কোন কথা তিনি রাখেন না"। এরপর বঙ্গবন্ধু ১৯৬৯ এ আবারো নারায়ণগঞ্জে মিটিং করলেন নির্বাচনী মিটিং। বঙ্গবন্ধু সবসময় কৌতুক করে বক্তব্য রাখতেন, সকল মানুষ নীরব হয়ে বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতা শুনতো, মাইলের পর মাইল দূর হতে পায়ে হেঁটে এসে, চারটার মিটিং এমনকি দুইটার সময় মাঠ ভরে যেত মানুষের ভীড়ে। সেই মিটিং-এ যেখানে বক্তৃতা দিয়েছিলেন পিছনেই ছিল রেললাইন বঙ্গবন্ধু বক্তৃতার সময় রেল যাওয়া-আসা করছিল, বঙ্গবন্ধু তখন বলেছিলেন "আমি যখন বক্তৃতা দেই তখন ট্রেন আসে আর যায়, আসে আর যায়"।

এরপর বঙ্গবন্ধুর সাথে আমি সফরসঙ্গী হয়েছি। আমার মনে পড়ে ১৯৬৯ এ নির্বাচনী প্রচারে বঙ্গবন্ধু সিলেট রওয়ানা হলেন। আমি ও আমার ভাই নারায়ণগঞ্জের প্রখ্যাত ছাত্রনেতা এবং আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক যাকে ১৯৮১ সালের ৩ নভেম্বর ভোর রাতে আওয়ামী লীগ অফিসে বিএনপির সন্ত্রাসীরা নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছিল, উনি ছিলেন আমাদের নেতা, আমরা এখনও যারা জেলা কমিটির মধ্যে নেতৃত্বে আছি, যাদের ৭০ উর্ধ্ব বয়স হয়েছে আমরা সবাই মনিরুল ইসলাম ভাইয়ের শিষ্য। মনিরুল ভাই আমাদেরকে রাজনীতিতে এনেছিলেন। বঙ্গবন্ধু মনির ভাইকে অত্যন্ত আদর করতেন এবং উনার কথা বঙ্গবন্ধু মনোযোগ

দিয়ে শুনতেন। বঙ্গবন্ধু মনির ভাইকে বললেন "মনির ঠিক সাতটার সময় ডেমরা ঘাটে উপস্থিত থাকবি" তখন সিলেট যেতে হলে ডেমরায় ফেরি ছিল ওই ফেরি পার হতাম ওখান দিয়ে গিয়ে তারপরে মেঘনা ফেরি ছিল, দাউদকান্দি ফেরি ছিল, তারপর ময়নামতি হয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া হয়ে সিলেটে যেতে হতো। আমরা রওয়ানা হলাম, ঠিক সাতটার সময় ডেমরা ঘাটে উপস্থিত ছিলাম। যিনি আমাদেরকে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, তিনি ৭০ এ নারায়ণগঞ্জের আওয়ামীলীগের এমপি হয়েছিলেন নারায়ণগঞ্জের প্রখ্যাত ব্যবসায়ী এআর ভূঁইয়া সাহেব এর ছেলে আব্দুস সাত্তার ভূঁইয়া আমাদের প্রিয় বাদশা ভাই। উনি ওনার নিজস্ব গাড়িতে আমাদেরকে নিয়ে রওয়ানা হলেন বাদশা ভাই নিজেই গাড়ি ড্রাইভ করছিলেন। ঠিক সাড়ে সাতটা নাগাদ বঙ্গবন্ধু ঘাটে আসলেন আমরা ফেরিতে উঠলাম, ফেরিতে বঙ্গবন্ধুর গাড়ি ওঠার পরে নেতৃবৃন্দের কিছু গাড়ি উঠলো, সাথে সঙ্গী হলেন খন্দকার মোশতাক, তাহের উদ্দিন ঠাকুর প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। যখন ফেরি ছাড়বে এমন সময় বঙ্গবন্ধু বললেন, "একটু দেরি কর, আমাকে বঙ্গবন্ধু ডাকলেন এদিকে আয়, দুই প্যাকেট সিগারেট নিয়ে আয়" বঙ্গবন্ধু ক্যাপেস্টান সিগারেট খেতেন আমি আনতে যাব তখন বঙ্গবন্ধু আবার ডাকলেন, "এই শোন, একটা দিয়াশলাই সাথে আনিস"। বঙ্গবন্ধু যে আমাকে বললেন আমার জন্য সিগারেট আনবি দিয়াশলাই আনবি, আমি নিজেকে ধন্য মনে করি বঙ্গবন্ধুর মতো একজন বিশ্বনেতা আমাকে হুকুম করেছিলেন। ফেরি পার হয়ে রওয়ানা দিলাম, আজকের প্রজন্মের যারা তাদের বিশ্বাস করতে কষ্ট হবে, প্রত্যেকটা মোড়ে মোড়ে বিশাল জনতা বঙ্গবন্ধুকে সম্মান জানানোর জন্য দাঁড়িয়ে আছে। এরপর কাঁচপুর মোড়ে বিশাল জনসভা হলো, পরে মদনপুর তারপর মোগরাপাড়া চৌরাস্তা তারপর ইলিয়েটগঞ্জ, চান্দিনা এরপর ময়নামতি ক্যান্টনমেন্ট তারপরে কোম্পানিগঞ্জ বাজার দেবিদ্বার, কুটি চৌমুহনী সুলতানপুর এর পর ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরে পৌঁছলাম। প্রত্যেকটা জায়গায় হাজার হাজার লোকের সমাবেশ বঙ্গবন্ধু কোন বিরক্ত প্রকাশ ছাড়াই সব জায়গায় জনসভা করেছেন। বঙ্গবন্ধু জানতেন হাজার হাজার মানুষ পায়ে হেঁটে এসে দীর্ঘ সময় ধরে তার জন্য অপেক্ষা করছে একবার তাকে দেখার জন্য তার মুখের দুটি কথা শোনার জন্য। ব্রাহ্মণবাড়িয়া যাওয়ার আগ পর্যন্ত ৮ থেকে ১০ জায়গায় বঙ্গবন্ধু পথসভা করেছেন। সেই পথসভায় আজকালকার যেকোনো জনসভা থেকে অনেক বেশি জনসমাগম হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু কোনরকম ইতস্ততা বা বিরক্ত প্রকাশ না করেই গাড়ি থেকে নেমে

অস্থায়ী স্টেজে উঠে তার বক্তব্য রেখেছেন প্রত্যেকটা বক্তব্যেই বঙ্গবন্ধু বাংলার জনগণের অধিকার আদায়ের জন্য যে সংগ্রাম করে যাচ্ছিলেন তা জনগণের মনে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। জনগণের জন্য বঙ্গবন্ধুর যে কতটা টান ছিল মানবতার খাতিরে বঙ্গবন্ধু যে কি করতে পারতেন তার ছোট একটা উদাহরণ দেই। ১৯৬৯ সালে একটা টর্নেডো হয়েছিল। যে টর্নেডোতে ডেমরা বাওয়ানী জুট মিলের দেয়াল ভেঙ্গে গিয়েছিলো চাল উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল এবং কুমিল্লার দেবিদ্বার ও মুরাদনগর থানায় অনেক লোকজনের ক্ষতি হয়েছিল, অনেক লোকজন মারা গিয়েছিল। বঙ্গবন্ধু এদের জন্য এক লঞ্চ বোঝাই করে রিলিফ নিয়ে রওয়ানা হলেন পাগলা ঘাট থেকে। আমরা খবর পেলাম উনি যাবেন আমাদের সোনারগাঁয়ের এখান দিয়ে, কালাপাহাড়িয়া আড়াইহাজারের ভিতর দিয়ে বঙ্গবন্ধু ঢুকবেন। বঙ্গবন্ধু যাচ্ছেন যাওয়ার সময় লঞ্চের মধ্যে আমাদের নারায়ণগঞ্জের আরেক নেতা মো নায়েম সাহেব বললেন মুজিব ভাই একটু দেখেন এই গ্রামটা একদম ধ্বংস হয়ে গেছে। একটা ঘরবাড়িও নাই হাজার হাজার লোক দাঁড়িয়ে আছে বঙ্গবন্ধু যাবেন এই খবর পেয়ে, বঙ্গবন্ধু নিঃস্ব অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকা লোকদের দেখলেন, লঞ্চ ভিড়াতে বললেন।

বঙ্গবন্ধু লঞ্চ থেকে নেমে কিছু ঘরবাড়ি দেখলেন, এরপর গাজী গোলাম মোস্তফা সাহেব কে বললেন "গাজী টিন কতগুলি আছে", গাজী ভাই বললেন ২৫০ বান্ডিল টিন আছে ভাই। "টিউবওয়েল কতগুলো আছে", গাজী ভাই উত্তর দিলেন ১৫০ টা। বঙ্গবন্ধু গাজী ভাইকে বললেন "টিন ও টিউবওয়েল সমস্ত ঘরে ঘরে বিলিয়ে দাও, তারা যাতে ঘর উঠাতে পারে এবং টিউবওয়েল বসাতে পারে সেই ব্যবস্থা করো"। প্রত্যেকটা বাড়িতে বাড়িতে টিউবয়েল বসে গেল ঘরের চালে টিন উঠে গেল মোনায়েম সাহেবকে দায়িত্ব দিয়ে গেলেন, এবং গাজী ভাইকে বললেন" তুমি বাই রোডে ঢাকা যাও রিলিফ নিয়ে আসো ওখানকার জন্য" আমি লঞ্চে মুরাদনগর যাচ্ছি"। কালাপাহাড়িয়ার মানুষ কৃতজ্ঞতা স্বরূপ ৫২/৫৩ বছর ধরে এখনও প্রত্যেকটা নির্বাচনে ওই এলাকার প্রত্যেকটা কেন্দ্রে আওয়ামী লীগের বাইরে ভোট দেন না।

বঙ্গবন্ধুর যে একটা মানুষের প্রতি টান, মানুষের প্রতি মমতা ছিল তা যারা দেখেন নাই তাদের বিশ্বাস করতে কষ্ট হবে। আমি অনেক বক্তব্যে বলি বঙ্গবন্ধু একজন রাজনীতিবিদ, বঙ্গবন্ধু একজন রাজনৈতিক কবি, বঙ্গবন্ধু একটা মহাকাব্য লিখে

গিয়েছিলেন যার নাম বাংলাদেশ। এই বাংলাদেশের টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া পর্যন্ত এমন একটা গ্রাম ছিল না এমন একটা জায়গা ছিল না যার সাথে বঙ্গবন্ধুর আত্মার আত্মীয়তা ছিল না।

এই ছিলেন বঙ্গবন্ধু যিনি আমাদের একটা দেশ দিয়ে গেছেন, একটা পতাকা দিয়ে গেছেন, আমরা একটা পাসপোর্ট পেয়েছি।

বঙ্গবন্ধুর স্রোতধারায় বঙ্গবন্ধুর কন্যা এখন একটা অনুন্নত দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন ইনশাল্লাহ অল্পকিছুদিনের মধ্যে ইউরোপের অনেক দেশের সাথে প্রতিযোগিতা দিতে পারবে আমাদের এই বাংলাদেশ। আমি বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেক হায়াত কামনা করি।

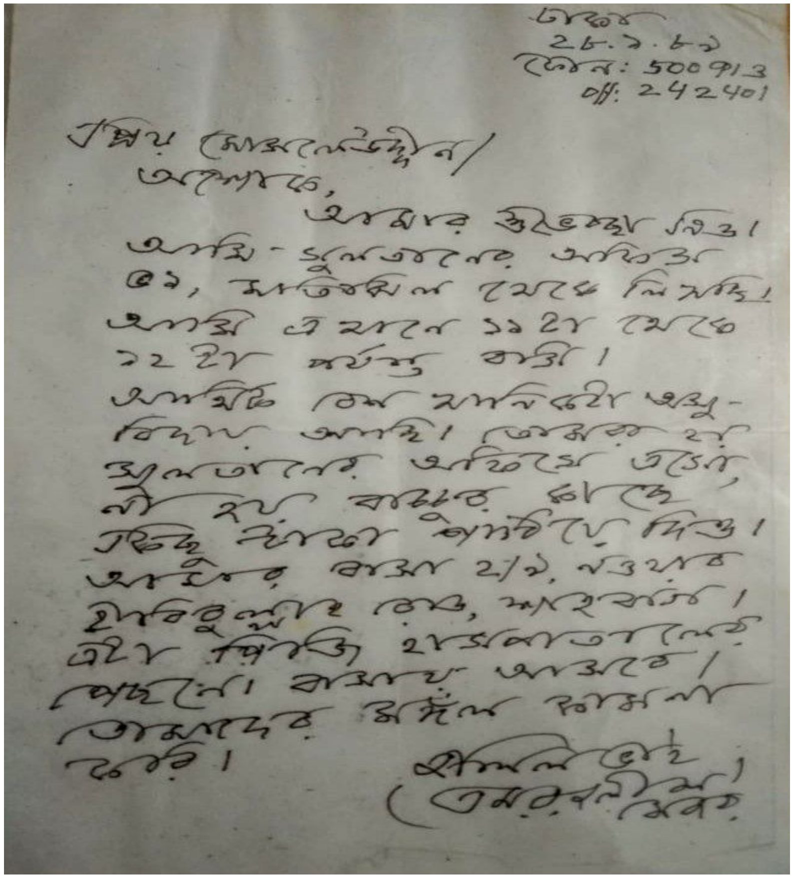
ঢাকা
২৮.১.৮১
ফোন: 500913
off: 242401

প্রিয় মোসলেহউদ্দীন/
[illegible],
আমার শুভেচ্ছা নিও।
আমি - [illegible] অফিসে
৫১, মতিঝিল থেকে লিখছি।
আমি এ মাসের ১১ই থেকে
১২ই পর্যন্ত [illegible]।
[illegible]
[illegible] আছি। [illegible]
[illegible] অফিসের [illegible],
[illegible]
[illegible] দিও।
অফিসের [illegible] ২/১, নওয়াব
হাবিবুল্লাহ রোড, [illegible]।
[illegible]
[illegible]
তোমাদের [illegible]
[illegible]।
[illegible]
([illegible])

গুরুদক্ষিণা

আজ আমি এমন একটা স্মৃতি তোমাদেরকে জানাবো, আজ বাংলাদেশ সংসদে মহিলা এমপি সহ ৩৫০ জন সংসদ সদস্য আছেন ওনারা কেউ এই ঘটনাটা ঘটানও নাই বা এমন ঘটনা ঘটাতে পারে তা কেউ জানেনও না। আমি আজ যার কথা নতুন প্রজন্মকে জানাতে চাই উনি আজ প্রয়াত, উনি হচ্ছেন নারায়নগঞ্জ এর কিংবদন্তী ওসমান পরিবারের ছেলে শামসুজ্জোহা, আমাদের জোহা ভাইয়ের বড় ছেলে নাসিম ওসমান, যাকে আমি নিজ হাতে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রশিক্ষণ দিয়েছি। যদিও ছোট বেলা থেকে আমি কোলে পিঠে করে বড় করেছি আমি তার মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষক ছিলাম, ছোটবেলা থেকে তার সাথে আমার পারিবারিক একটা সম্পর্ক ছিল, তার জন্ম আমার মনে হয় ১৯৫৩ সালে হবে আমি তখন প্রথম শ্রেণীর ছাত্র তার এক ফুপু আমার সাথে পড়তো, নাসিম ওসমান সম্পর্কে আগে আমি বলেছি কিন্তু আজ বলবো যে সে কত বড় মনের মানুষ ছিল। ১৯৮৬ সালে প্রেসিডেন্ট এরশাদ সাহেব ক্ষমতায়। ১৯৮৬ সালে বাংলাদেশের সংসদ নির্বাচন হয়েছিল, সেই নির্বাচনে জাতীয় পার্টি থেকে নির্বাচন করে নাসিম ওসমান এমপি হয়েছিলেন। আজ আর তিনি আমাদের মাঝে নেই, প্রায় আট বছর আগে তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছেন। আল্লাহ তাকে বেহেশত নছিব করুন। আমি আজ যে ঘটনাটা বলবো তা হলো, ১৯৮৬ সালের১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস, আমি তখন নারায়নগঞ্জ এ থাকি, ১২ নম্বর ওয়ার্ড, ১২ নম্বর ওয়ার্ডের তখন তৎকালিন কমিশনার ছিলেন আজহারুল ইসলাম তিনি আজও জীবিত আছেন। আজহারুল ইসলাম সাহেব ১২ নম্বর থেকে নাসিম ওসমানকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য বিজয় দিবসে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করলেন। অনুষ্ঠানে আমাকেও আমন্ত্রণ করা হলে আমিও একজন অতিথি হিসেবে গেলাম। অনুষ্ঠান শুরুর প্রাক্কালে নাসিম ওসমান এসে হাজির হলেন অনুষ্ঠানে মুহুর মুহু শ্লোগান হচ্ছে, নাসিম ওসমানকে অভিনন্দন জানালো ১২ নম্বর ওয়ার্ডের অধিবাসীগণ। আমি প্রথম সারিতে দর্শকদের মাঝে সকলের সাথে বসে আছি। অনুষ্ঠান শুরু হলো, সঞ্চালক ঘোষণা করলেন আজকের অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করবেন ১২ নম্বর ওয়ার্ডের কমিশনার আজহারুল ইসলাম আমি তাকে তার আসন গ্রহণের জন্য অনুরোধ করছি। উনি উঠে গেলেন আসন গ্রহণ করলেন, এরপর ঘোষণা হলো, আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি নারায়নগঞ্জের ৫ আসনের সংসদ সদস্যকে অনুরোধ করলেন তার আসন গ্রহণের জন্য। নাসিম ওসমান তখন আমার পাশ থেকে উঠে তার আসনে না বসে মাইকটা হাতে নিয়ে উনি বক্তব্য শুরু

করলেন, আজকের উপস্থিত ভাইয়েরা আজকে আমাকে এখানে প্রধান অতিথি করা হয়েছে, আজকে বিজয় দিবস এই দিনে আমরা পাকিস্তানের কাছ থেকে আমাদের এই বাংলাদেশ ছিনিয়ে এনেছিলাম। সেজন্য আজকে এই বিশেষ দিনটি পালন করতে যাচ্ছি তার মাধ্যমে এই ওয়ার্ডের জনগণ আমাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। কিন্তু আমি অত্যন্ত গর্বের সাথে বলতে চাই আজকে এখানে উপস্থিত আছেন মুক্তিযুদ্ধের সময় আমার অস্ত্রের প্রশিক্ষক, আমার শ্রদ্ধেয় বড় ভাই আমাদের মিজানুর রহমান বাচ্চু ভাই। আর উনি এখানে উপস্থিত থাকা অবস্থায় আমি এখানে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করতে পারি না। তাই আমি অনুরোধ করবো আজকে এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে আসন গ্রহণ করবেন আমার যুদ্ধকালীন প্রশিক্ষক আমার শ্রদ্ধেয় বড় ভাই জনাব মিজানুর রহমান বাচ্চু ভাই। আমি বিনীতভাবে অনুরোধ করছি ওনার আসন গ্রহণ করার জন্য। আমি বিচলিত হয়ে গেলাম, আজ পর্যন্ত আমার ৭৫ বছর বয়স হয়ে গিয়েছে আমি বহু সংসদ সদস্য দেখেছি, আমি এটা কোন দিন দেখি নাই যে প্রধান অতিথি তার আসন ছেড়ে দিয়ে তার বড় ভাই তার প্রশিক্ষককে এভাবে সম্মান দিয়েছেন। সত্যি এটা আমার জীবনের একটা পরম পাওয়া। আপত্তি জানাতে জানাতেও তার অনুরোধে আসনে গিয়ে বসলাম। এরপর অনুষ্ঠান শুরু হলে সবাই তাদের বক্তব্য রাখলেন আমিও সাংসদের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করে বক্তব্য রাখলাম। এরপর আর একটা ঘটনা আমার জন্য অপেক্ষা করছিল ওখানে যারা উপস্থিত ছিল তাদেরকে ক্রেস্ট দিয়ে বরণ করা হচ্ছিল, মাইকে ঘোষণা হল আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথিকে ক্রেষ্ট দিয়ে অভ্যার্থনা জানাচ্ছেন আজকের অনুষ্ঠানের সভাপতি ১২ নং ওয়ার্ডের কমিশনার জনাব আজহারুল ইসলাম, কমিশনার ক্রেষ্ট নিয়ে এগিয়ে যেতেই নাসিম ওসমান মাইক হাতে নিয়ে বললেন আমি আজকের অনুষ্ঠানের প্রারাম্ভেই বলেছি আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি আমাদের শ্রদ্ধেয় বড় ভাই জনাব মিজানুর রহমান বাচ্চু ভাই, তাই, হোক আমার নামে ক্রেস্ট তবু আজকে আমি এই ক্রেস্ট মিজান ভাইকে দিয়ে আমি নিজেকে কৃতার্থ মনে করবো। উনি তাই করলেন, আজ সে আমাদের মাঝে নেই। আজও আমি যত্ন সহকারে ক্রেস্টটি রেখে দিয়েছি, যখন আমি ক্রেস্টটি দেখি তখন অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি অনেক স্মৃতি মনে পড়ে যায়, যে নাসিম তুমি যেখানেই থাকো আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করি তুমি ভালো থাকো।

আমার সেই ফেলে আসা বাকুন্ডি ক্যাম্পে একদিন ফিরে যাওয়া

অক্টোবার ১৯৭১ এ আমি বাকুন্ডি ক্যাম্প ত্যাগ করে বাংলাদেশের ভিতরে এসেছি এরপর আর বাকুন্ডি ক্যাম্পের খোঁজ-খবর রাখি নাই। প্রায় ৪৬ বছর পর আমি শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে ভারতে গিয়েছিলাম চিকিৎসা করার জন্য। কোলকাতায় পাতাল ষ্টেশন, রবীন্দ্র সরোবর ষ্টেশনে নেমে প্লাটফর্মে উঠে রাস্তার অপর পাড়ে একটা মেডিকেল সেন্টার আছে তার নাম মেড্‌িক্লু, আমি সেখানে ভর্তি হয়েছি চিকিৎসার জন্য। ওখানে ২/৩ মাস পর পর আমার যাতায়াত ছিল। ২০১৭ সালে একদিন আমি মেডিক্লু থেকে বিদায় নিয়ে সন্ধ্যার সময় নিউমার্কেটে এসে একটা হোটেলে থাকবো বলে প্লাটফর্মে এসে দাড়িয়ে আছি আমার সাথেই একটা অল্প বয়সের ছেলে তার সাথে একটা বোরকা পরা মেয়ে আছে দুজনে আলাপচারিতা করছে। ছেলেটা আমাকে জিজ্ঞাসা করলো দাদা কয়টা বাজে? আমার হাতের মোবাইল দেখে আমি বললাম, ছেলেটা ষ্টেশনের ঘরির সাথে মিলিয়ে দেখলো টাইম ঠিক আছে। ছেলেটা আমাকে আবার জিজ্ঞাসা করলো দাদা আপনার বাড়ি কি এখানে আমি বললাম না আমি বাংলাদেশের, ঢাকা থেকে এসেছি। এর পরে আমি ছেলেটাকে জিজ্ঞাসা করলাম তোমার বাড়ি কোথায়? সে উত্তর দিল আমার বাড়ি হাসনাবাদ। আমি আবার তাকে বললাম তুমি কি টাকি চিনো? সে বললো হ্যা চিনি। ছেলেটা আমাকে বললো আপনি চিনেন? আমি বললাম আমি চিনি, মুক্তিযুদ্ধের সময় আমার ট্রেনিং ক্যাম্পটা ওখানে ছিল। ছেলেটা বললো আপনাদের ট্রেনিং ক্যাম্পতো টাকিতে ছিল না, ট্রেনিং ক্যাম্প ছিল বাকুন্ডিতে। আমি ছেলেটাকে বললাম তুমি বাকুন্ডি চিনো? ছেলেটা বললো বাকুন্ডির সাথেই আমার বাড়ি। আমি তাকে বললাম, তুমি আমাকে একটু যাওয়ার পথটা বলে দেও তো। ছেলেটা বললো আপনি যাবেন? আমি বললাম না রাত হয়ে গেছে এখন যাবনা তবে আমি খুব তাড়াতাড়ি সময় করে এসে ওখানে যাব, তুমি আমাকে বলে দাও আমি কিভাবে যেতে পারবো। তখন ছেলেটা বললো আমার নাম জসিম সরদার, আপনি আমার ফোন নাম্বারটা নেন, আমি ফোন নাম্বার নিলাম বললাম তোমার সাথে কে? সে বললো আমার স্ত্রী, আমি

বললাম আমি এমনটি ভেবেছিলাম। যাহোক ভালোই হলো আমি এলে তোমকে ফোন দিব তুমি আমাকে একটু জায়গাটা দেখাবে।

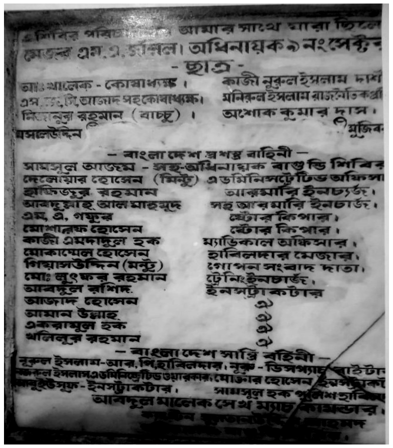

ছেলেটা বললো ঠিক আছে, আপনি যে টিনের ঘরটা প্রাইমারি স্কুল দেখেছেন সেটা এখন দোতলা স্কুল, প্রাইমারির সাথে হাইস্কুলও হয়েছে। আর আপনাদের যেখানে ট্রেনিং নেয়া হতো সেটা জমিদার বাবু বিক্রি না করে পুরোটা স্মৃতি হিসেবে রেখে দিয়েছেন। আর ভারতীয় সরকার ওখানকার স্থানীয় লোকদের দাবী রেখে একটা স্মৃতিসৌধ করে দিয়েছে যুদ্ধের পর পরই। আমি জিজ্ঞেস করলাম সেখানে কারো নাম আছে? ছেলেটা বললো অনেকের নাম-ই আছে সেই ফলকে। আমার কৌতুহল বেড়ে গেল কার কার নাম আছে আমাকে দেখতেই হবে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম আমি সেখানে যাব কিভাবে? সে বললো আপনি আসবেন কিভাবে? আমি বললাম আমি বাসে বেনাপোল হয়েও আসতে পারি আবার বিমানেও আসতে পারি। সে বললো বেনাপোল এসে বনগাও আসবেন, এসে ট্রেনে সরাসরি হাসনাবাদের টিকিট করবেন, হাসনাবাদের আগের ষ্টেশনটা হলো টাকি, আর তার আগের ষ্টেশন হচ্ছে নিমদরীয়া, নিমদরীয়া নেমে ষ্টেশনেই সিএনজি পাবেন দশটাকা ভাড়া নিবে আপনাকে নিয়ে একেবারে বাকুন্ডি ক্যাম্পে নামিয়ে দিবে। আমি ঢাকায় চলে এসে ঠিক একমাস পরে আবার রওয়ানা হলাম। যথারীতি বনগাও এসে ২০ টাকা ট্রেনের টিকিট কেটে ট্রেনে উঠে বসলাম বারাসাত থেকে ট্রেন পরিবর্তন করে নিমদরীয়া এস নেমে জসিম সরদারকে ফোন দিলাম এবং বললাম আমি তো নিমদরীয়ায়, জসিম বললো আমি তো কোলকাতায় আসতে বিকেল হবে আমি বললাম ঠিক আছে তুমি আসো, আবার বললাম আমি কিভাবে যাব? সে বললো প্লাটফরমের সামনে গিয়ে

দেখেন সিএনজি আছে তাদের বলেন আপনি বাকুন্ডি যাবেন। ওর কথামত গিয়ে আমি সিএনজ পেয়ে গেলাম এবং বাকুন্ডি হাইস্কুলের সামনে গিয়ে নামলাম। নেমেই স্কুলের গেটে একটা কনফেকশনারী দোকান পেলাম সেখানে একটা ছেলে বসেছিল তাকে বললাম আচ্ছা এখানে একাত্তরে বাংলাদেশ-পাকিস্তানের যুদ্ধের সময় ট্রেনিং মাঠ ছিল এবং ভারত সরকার ওখানে নাকি একটা স্মৃতিফলক করেছে সেটা কোথায়? ছেলেটা দেখিয়ে বললো এটা সেই ট্রেনিং মাঠ আর ওই যে স্মৃতিফলক। আমার বুক তখন দুরু দুরু করেছে, উত্তেজনায় হার্টবিট বেড়ে গেছে। ছেলেটা বললো আপনি কি যুদ্ধের সময় এখানে ছিলেন? আমি বললাম হ্যাঁ আমি এখানে ট্রেনিং নিয়েছি। ছেলেটা বললো একটু দাঁড়ান, বলে ডাকতে শুরু করল বাবা বাবা, ও বাবা তাড়াতাড়ি এসো লোক এসেছে, তাড়াতাড়ি আসো তুমি। ওর বাবা খেতে বসেছিল তাড়াতাড়ি হাত ধুয়ে এসে আমাকে দেখে বললো বলুন দাদা। আমি বললাম মুক্তিযুদ্ধের সময় আমি এখানে ট্রেনিং নিয়েছিলাম আমি শুনেছি এখানে নাকি একটা স্মৃতিফলক হয়েছে, সেটা দেখতে এসেছি, তিনি বলেলন হ্যাঁ, তিনি বললেন আপনি কি এখানে তখন ছিলেন, আমি বলালাম হ্যাঁ আমি ছিলাম। তিনি বললেন আমিওতো এখানে ছিলাম। আমি বললাম আপনি এখানে ছিলেন তো কি করতেন? তিনি বললেন আমি পাকঘরে ছিলাম। আমি বললাম পাকঘরে তো আমাদের আর্মিরা পাক করতো শুধু একটা লোকাল ছেলে ছিল বাচ্চা ছেলে তার নাম ছিল নাড়ু। তিনি বললেন আমি-ই তো নাড়ু। আমি বললাম তুমি নাড়ু তো তুমি কি আমাকে চিনছো? সে বললো না দাদা এতদিন আগের কথা ৪৫/৪৬ বছর হবে চিনতে পারছি না। আমি বললাম ক্যাপ্টেন কে ছিল? নাড়ু বললো সুলতান সাহেব। আমি বললাম সুলতান সাহেবের তাবুর মধ্যে আর কে থাকতো তুমি খাবার দিয়ে আসেতে? নাড়ু বললো একজন ছিলেন তাকে আমরা বাচ্চু দা বলে ডাকতাম। আমি বললাম নাড়ু আমি সেই বাচ্চু দা, তাড়াতাড়ি আমাকে জড়িয়ে ধরে ভিতরে নিয়ে গেল। তার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের ডাক দিল দেখ দেখ এরপর দৌড় দিয়ে তার মাকে ডেকে এনে বললো মা মনে আছে বৃষ্টির সময় তুমি তেল দিয়ে মুড়ি মাখিয়ে দিতে ক্যাপ্টেন ও বাচ্চু দার জন্য, সেই বাচ্চু দা এসেছে। ওর মা আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললো বাবা আমার তো বয়স হয়েছে চোখেও কম দেখি, তা বাবা আমরা এখান থেকে আর যাইনি এখানেই থেকে গিয়েছি। আমি নাড়ুকে বললাম তো চলো একটু দেখে আসি, দুরুদুরু বুকে গিয়ে দেখি অনেক নাম আছে সে নামের ভিতরে খুঁজতে শুরু করলাম আমার নামটা আছে কি-না। সৌভাগ্যবসত

আমার নামটা ৩ নম্বরে খুঁজে পেলাম। তখন আমার মনের মধ্যে একটা শক্তি এলো। আমি নিজে যে একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলাম এটা তার প্রমাণ। আমি নাড়ুকে বললাম এখন কি স্কুল চলছে? নাড়ু বললো দাদা প্রাইমারী ছুটি হয়ে গেছে এখন হাইস্কুল চলছে, খুব উজ্জীবিত মনে প্রধান শিক্ষকের রুমে গেলাম, বসতে দিল, আমি বললাম দেখেন আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি, আমার বাড়ি ঢাকায়, আমি শুনেছি এখানে একটা স্মৃতিসৌধ হয়েছে সেটা দেখার জন্য এসেছি আপনি যদি একটু আমার সাথে ওখানে যেতেন। তিনি বললেন ঠিক আছে চলেন চলেন বলে খুব উৎসাহ সহকারে আমাকে দেখাতে নিয়ে গেলেন, ওনাকে দেখালাম এই যে দেখেন আমার নামটা। আমি আমার পাসপোর্ট বের করে নামটা মিলিয়ে দেখালাম, ওরা আমাকে বললো আসেন অফিসে বসে কথা বলি। আমি বললাম না, আপনার এখানে কেউ কি আমাকে ভালো ছবি তুলে দিতে পারবেন, প্রধান শিক্ষক তার এক টিচারকে ডাক দিলেন তিনি এসে বললেন নামের মধ্যে হাত দিয়ে ধরেন আমি ছবি তুলে দেই। ছবি তুললাম এরপর আমার ছেলের সাথে ফোনে ওদের কথা বলিয়ে দিলে ছেলের হোয়াটসঅ্যাপে সেই ৩৫/৩৬ টা ছবি ওরা পাঠিয়ে দিল। তারপর ওরা আমাকে ধরলো বেড়াতে হবে। আমি বললাম আজ নয়, দেখে গেলাম পরে সময় করে আসবো। ওরা বললো দেখেন আজ ৪৬ বছর এখানে স্মৃতিসৌধ হয়েছে আমরা মাল্য দান করি অনুষ্ঠান করে, প্রতি বছর কিন্তু এখান থেকে ট্রেনিং করে গেছেন এই ৪৬ বছরে একটা লোককেও আমরা পাই নাই এখানে এসেছেন আজ আপনাকে পেলাম। আমাদের এখানকার একজন লোক আছেন বারাসাত বাড়ি উনি আমেরিকা থাকেন তিনি আমেরিকা থেকে এসে এখানে প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেন। আপনি বাংলাদেশ থেকে আসবেন, কত জন নিয়ে আসবেন আমাদের বলবেন আমরা আপনাদের সব কিছু এ্যারেজমেন্ট করবো। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস ওই অনুষ্ঠানটা আর করতে পারিনি। কারণ, করোনার আবির্ভাবে সব কিছু বন্ধ হয়ে গেলে গত ২ বছরে অনুষ্ঠান হয়নি। ওখান থেকে আসার পর আমি আরও ২ বার ওখানে গিয়েছি এবং আমাদের ৯ নং সেক্টরে যাদের সাথে দেখা হয়েছে তাদের সকলকে ছবিগুলো দিয়েছি।

গল্প নয় সত্যি

তোমাদের তো মনে আছে আমার ক্যাম্পটা ছিল বাজুয়া বাজর মোংলাপোর্ট এর সাথে। বাজুয়া বাজারে ক্যাম্পের মধ্যে দুপুর বেলা আমি বসে আছি। ফরিদ নানা একটা লোক নিয়ে আসলেন, আমাকে বললেন নানা তার কথাটা শোন আমি বললাম কি ব্যাপার ভাই। ওই লোকটা বললেন স্যার আমাদের এখানে একটা বাজার আছে অনেক বড় বাজার, বড় বড় দোকানপাট, যুদ্ধের সময় তারাই অনেক কষ্টে খাবার এনে আমাদের খাবারের যোগান দিয়েছে। বাজারের সামনে একটা শাখানদী ওপারে সুন্দরবন। রাজাকাররা আপনাদের হাতে মার খেয়ে সুন্দরবনে গিয়ে স্থান নিয়েছে এবং প্রতি সপ্তাহে বাজারের দিন সকালে রাজাকার রা বাজারে এসে জনগণের জন্য যে মাল আনা হয় তা লুট করে নিয়ে যায়। আমি নানাকে বললাম বাজারটা কতদুর? নানা বললেন আমাদের এই ক্যাম্প থেকে আট দশ মাইল হবে, আমি বললাম যাওয়ার পথ কি? নানা বললেন নদীপথ দিয়ে গেলে সময় বেশি লাগবে, আর হেটে গেলে দুই-আড়াই ঘন্টা লাগতে পারে। ঠিক আছে নানা আমরা হেটেই যাব, জায়গাটার নাম বানিয়াসান্তা, আমরা আলাপ আলোচনা করে জানলাম হাটবারের দিন ফজরের সময় রাজাকাররা আসে এবং লুটপাট করে নৌকায় করে নিয়ে চলে যায়। আমার ওই লোককে বললাম তুমি যাও আমরা খবর দিব। আমি নানার সাথে আলোচনা করলাম আমরা আগের দিন বিকেলে চলে যাব ওখানে স্কুল বা কারো বাড়িতে আশ্রয় নিব অসুবিধা হবে না। ঠিক পরের দিন আমি বেঙ্গল রেজিমেন্ট থেকে ৩০ জন সৈনিক নিয়ে আর ইউসুফকে নিয়ে চারটার দিকে রওয়ানা হলাম, মাগরিবের আযানের ঠিক আগে আগে ফরিদ নানা আমাদের নিয়ে গিয়ে একটা বাড়ির মধ্যে উঠালো। বাড়িটায় বিরাট বড় উঠোন, তিন চারটা ঘর, কোন ঘরে লোক নেই। এক ঘরে এক ভদ্র মহিলা নানার পরিচিত, নানা তাকে ডাক দিয়ে বললেন, তুমি একটা কাজ করো আমরা এখানে থাকবো একটা ঘর খুলে দাও। মহিলা বললো মামা আপনাদের একটা ঘরে তো হবে না, এখানে তিনটা ঘর খালি আছে, তিনটা ঘরই আপনাদের লাগবে। মহিলা ঘর খুলে দিলেন আমরা এক একটা ঘরের মধ্যে দশজন করে নিজেদের মতো জায়গা করে নিলাম। সন্ধ্যার পর নানাকে বললাম নানা এদেরতো খাবার ব্যাবস্থা করা লাগে। নানা বললেন আমি দেখে আসছি, কিছুক্ষণ পরে নানা এসে বললেন খাবার ব্যাবস্থা হচ্ছে। আমি বললাম এতো লোকের খাবার ব্যাবস্থা কি করতে পারবে বরং আমি বাজার থেকে

কিছু চিড়া মুড়ি নিয়ে আসি, নানা বললেন ঠিক আছে আপাতত চা বিস্কুটের ব্যাবস্থা করি। আমি টাকা দিলাম বাজার থেকে চা বিস্কুটের ব্যবস্থা করা হলো। সবাই চা বিস্কুট খেল। মোটামুটি পেট সবার শান্ত হয়েছে দুই তিন ঘন্টা কাটানো যাবে। রান্নাবান্না কি হচ্ছে তা আমরা জানিনা আর জানার চেষ্টা ও করিনি। নানা বললেন ব্যবস্থা হবেনে। রাত এগারোটার দিকে ওই ভদ্রমহিলা নানাকে ডেকে বললেন মামা সব ঘরে মিলিয়ে ১৫ খানা প্লেট হয়েছে তোমাদের তো একবারে খাবার দিতে পারবো না, নানা বললেন ঠিক আছে ২/৩ বারে খাবার দেন। আমরা ১৫/১৬ জন খেতে বসলাম, আমি অবাক হয়ে গেলাম বলের মধ্যে দেখে তারা খাসির মাংস রান্না করেছে। যাহোক কোন প্রশ্ন করলাম না, অনেক দিন পর এতো মাংশ পেয়ে সবাই খুব তৃপ্তির সাথে খাওয়া দাওয়া করলাম। খাওয়া দাওয়ার পর নামাজ শেষে যথারীতি আমরা শুয়ে পড়লাম এবং ৪ জন সেন্ট্রি রাখলাম তারা যেন আমাদের পাহারা দেয় এবং ঠিক তিনটার সময় আমাদের ডেকে দেয়। ঠিক সময় মতো আমাদের ডেকে দিল যারা সেন্ট্রি ছিল তাদেরকে রেষ্টে রেখে বাকি ২৭ জন আমরা বাজারে গিয়ে পৌঁছলাম চারটা বাজার কিছু আগে। ওই লোকটিকে বললাম রাজাকাররা কোথায় আসে কিভাবে আসে? সে বললো ওরা তিন চারটা নৌকা নিয়ে আসে আর ফজরের সময় মানুষ ওঠার আগে ওরা কাজ সেরে চলে যায়। তখন বাজে সাড়ে তিনটা আমাদের বললো এই ঘাটে এসে নৌকা ভিড়ায়, তখন আমরা ওখানে পজিশন নিয়ে থাকলাম। ১০/১৫ মিনিটের মধ্যে দুরে দেখা গেল আবছা ভাবে নৌকা আসতেছে। ৫/৭ মিনিটের মধ্যে নৌকাগুলি এসে ভিড়লো, ভিড়ে তিনটা নৌকায় ৭ জন অস্ত্র নিয়ে দোকান ঘরের দিকে যাবে ষ্টেপ নিয়ে আমাদের বরাবর এসেছে এমন সময় আমি হোল্ড বলার সাথে সাথে তারা আশ্চার্য হয়ে গেল। তারা রাইফেল ধরে গুলি করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে এমন সময় রফিক সাহেব ২টা ফায়ার করে ফেলল, আর একজন চিৎকার করে বলল একটা গুলি করবি না সব মেরে ফেলবো। ওরা আমাদের এতো লোকের পজিশন দেখে ঘাবড়ে গেছে আমরা ওদেরকে ধরলাম, মাঝি তিন জনকেও ধরে আনলাম। আমরা যখন ওদেরকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি তখন দূর মসজিদে আজানের ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। নানাকে বললাম কি করা যায় এদেরকে? নানা বললেন শালারা খুব ডির্স্টাব করেছে এখানকার লোকদের ওদরে মেরে ফেলো। আমি বললাম নানা ওরা স্যারেন্ডার যখন করেছে ওদের মারা ঠিক হবে না। আমরা এক কাজ করি ওদেরকে ক্যাম্পে নিয়ে যাই।

ওদের হাত পা বেধে ওদের নৌকায় উঠালাম তিন নৌকায়, ৭ জনকে দিলাম সাথে আমাদের ৬/৭ জন সোলজার দিলাম প্রতি নৌকায়। ওরা নৌকা নিয়ে বাজুয়া বাজার ক্যাম্পে নিয়ে যাবে, সোলজারকে বললাম ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে ওদের খুঁটির সাথে বেধে রাখবে মাঝিদেরকেও বেধে রাখবে। আমরা ক্লান্ত ছিলাম তাই একটু রেষ্ট নেবার জন্য ওই বাড়িতে এসে আবার একটু ঘুমালাম। ঘুম ভাঙ্গার পরে ৯টার দিকে সকলকে ডেকে রেডি হলাম আমরা ক্যাম্পের দিকে ফিরে আসবো। এমন সময় আমরা দেখলাম যে ভদ্রমহিলা আমাদেরকে খাইয়েছে তার সামনে ছোট একটি ছেলে খুব কান্নাকাটি করছে এবং বলছে, মা মন্টুরে তো পাই না কোন জায়গায়, ওর মা বলছে চুপ থাক। সে চুপ থাকে না আবার বলে, মা মন্টুরে তো কোনোখানে পাইতেছিনা, আমার মন্টু কই। মা বলে দেখ গেছে কোন জায়গায় আমি পরে খুঁজে দেবনে, ছেলে বলে না মা নেই কোন যায়গায়, তুমি কই খুঁজবা আমি সব জায়গায় দেখে আসছি। কোন জায়গায় নেই আমার মন্টু। মা তখন মুখে আঁচল দিয়ে থাকে, ফরিদ নানা জিজ্ঞেস করলো কি হয়েছে মন্টু কে? তিনি বলেন না বাবা কিছু না, আপনি এটা শুনেন না। ছেলেটা বলে মা তুমি আমার মন্টুকে এনে দাও বলে মাটির মধ্যে গড়াগড়ি দিতে থাকে। তখন নানা আরো জোর করে বলে মন্টু কে বলো আমরা খুঁজে এনে দেই। তখন মা কেঁদে দিল আমরা বললাম রহস্যটা কি? খালাকে ধরা হল, খালা মন্টুটা কে বল আমাদের কাছে, আমাদের যে লোক আছে আমরা খুঁজে এনে দেই। খালা বললেন না বাবা তোমরা এটা শুনো না আমরা বললাম না খালা বলেন। খালা কাঁদতে কাঁদতে বললেন মন্টু হচ্ছে তার একটা ছাগোল। ছাগলটাকে সে পালতো সারাটা দিন ছেলেটা তাকে নিয়ে খেলাধুলা করতো। আমি বললাম কই সেটা? খালা বললেন তোমরা অসময়ে এসেছো, আমার তো রান্না করার কিছু ছিল না তাই চাল ডাল জোগাড় করে এনে মন্টুকে জবাই করে তোমাদের রান্না করে খাইয়েছি। আমার চোখে পানি ধরে রাখতে পারলাম না। সবার চোখে পানি এসে গেল। এমন একটা ঘটনা ঠিক মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রত্যেকটা মা তার সন্তানকে মুক্তিযুদ্ধে পাঠাতেন, সন্তান মারা যাবে তারা তা চিন্তাও করে নাই, বঙ্গবন্ধুর ডাকে বাংলার জনগণ উদ্বুদ্ধ হয়ে পাগল হয়ে গিয়েছিল। স্বাধীনতাকে ছিনিয়ে আনার জন্য। আমরা খালাকে কি বলবো, বলার কোন ভাষা নেই। তখন আমি নানাকে বললাম নানা একটা ছাগলের দাম কত? নানা বললেন ৬০/৭০ টাকা হবে। আমি নানাকে ২০০ টাকা দিয়ে বললাম এটা খালাকে দিয়ে দেন নানা তাকে

২০০ টাকা দিলে খালা বললেন আপনারা দেশের জন্য জীবন বাজী রেখেছেন, আমি কি অন্যায় করলাম, আমি কি আপনাদের জন্য এতটুকু করতে পারি না? দুদিন পরে ও ওর ছাগলের কথা ভুলে যাবে, তিনি সে টাকা আর রাখলেন না। আমি মনে মনে ভাবলাম আমরা তো সারা জীবনেও একথা ভুলতে পারবো না। আমরা ফিরে এলাম সারাটা রাস্তা কারো মুখ দিয়ে কোন কথা বের হয় নি, ক্যাম্পে গিয়ে রাজাকাদের যথাযথ কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেবার ব্যবস্থা নিলাম আর মাঝিদের বললাম তোরাও তো রাজাকার, তোরা কেন এদের সাথে গিয়েছিস? এখন থেকে আমি যতদিন এই ক্যাম্পে থাকি ততদিন তোরা সকাল ছয়টা বাজে এসে আমার সাথে দেখা করে কাজে যাবি, মাঝিদের সব তথ্য রেখে ওদের হাজিরা দেবার শর্তে ছেড়ে দিলাম।

- মানুষ বিপদে পড়লে বোঝা যায় পৃথিবীটা কত কঠিন, কে আপন কে পর চেনা যায়

মুক্তিযুদ্ধে আমি যাদের সহযোগীতা পেয়েছি

এ কে এম শামসুজ্জোহা

শফি হোসেন খান

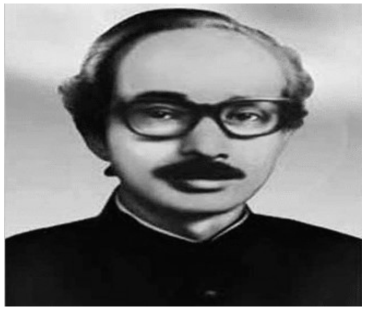

আলী আহমেদ চুনকা

জহুর আহমেদ চৌধুরী

মিজানুর রহমান চৌধুরী

মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য যাদের আমি শ্রদ্ধা ও সম্মান করি এবং যাদের বীরত্ব আমি নিজে দেখেছি

মেজর এম এ জলিল

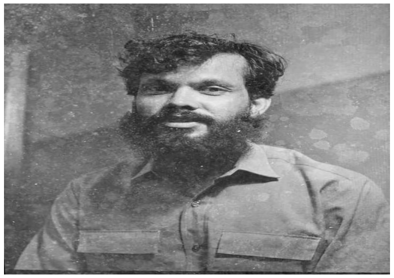

ক্যাপ্টেন সুলতান উদ্দিন আহমেদ

মরহুম এ কে এম নাসিম ওসমান

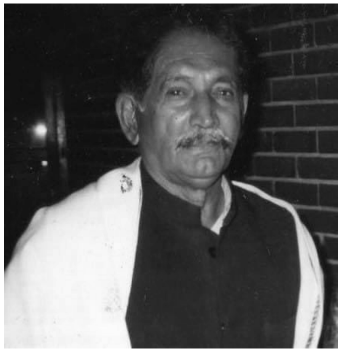

শেখ ফরিদ উদ্দিন আহমেদ

ক্যাপ্টেন বাবুল

কামাল উদ্দিন

যাদের কোন দিন আমি ভুলবো না

শেখ ফজলুল হক মনি	সিরাজুল আলম খান
ফেরদৌস আহমেদ কোরেশী	তোফায়েল আহমেদ
আবু সুফিয়ান	বজলুর রহমান